গল্প নয়

সত্যি

গল্প নয় সত্যি

ডঃ প্রণিত রায়চৌধুরী এম. এ., পি. এইচ. ডি.
[বিভাগীয় প্রধান, ভারত-সংস্কৃতি ; নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় প্রাক্তন শিক্ষক, হরিনাভি অ্যাংলো সংস্কৃতি বিদ্যালয় ; রাজপুর বিদ্যানিধি বিদ্যালয়]

পারমিতা পাবলিকেশন
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
রত্না ঘোষ
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর : ১৯৮৬

প্রচ্ছদ : সত্য চক্রবর্তী
অলংকরণ : স্বপন দেবনাথ

মুদ্রক :
টি. সেন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৮/১, চিন্তামণি দাস লেন

দাম : আট টাকা মাত্র

সূচীপত্র

দক্ষিণেশ্বরের সাধু

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে রানী রাসমণির তৈরী মা ভবতারিণীর মন্দির। মন্দিরের কাছেই একটা ছোট ঘরে থাকেন এক সাধু। সাধুটির সরল ব্যবহার মধুর আচরণে সবাই মুগ্ধ। কতজন আসে তাঁর কাছে শুধু দুটো মুখের কথা শুনতে। আসেন কত জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত মানুষ, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সকলেই এই সরল সাধুর কথা শুনে অবাক হয়ে যান। বেদ-বেদান্তের কোন কথাই তাঁর অজানা নেই। অথচ সাধুটি নাকি নিরক্ষর—লিখতে-পড়তেই জানেন না।

একদিন এক ধনী মারোয়াড়ী ভদ্রলোক এলেন এই সাধুটির কাছে। সাধুটির সঙ্গে কথা বলে মারোয়াড়ী তো ভারি আশ্চর্য। মানুষ এত জ্ঞানী হতে পারে আর এত নির্লোভ! তিনি নিজে নানা ধরনের লোক চরিয়ে খান। অসৎ আর শঠ কত লোকের সঙ্গেই না কাজ কারবার করেন। যাচিয়ে বুঝলেন এ সাধুটি খাঁটি সোনা। তাই প্রণামী-স্বরূপ হাজার দশেক টাকার একটা চেক সাধুটির সেবক তাঁর ভাগনের হাতে দিয়ে এলেন। এদিকে সাধুটি দেখতে পেয়েছিলেন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক কি যেন একটা কাগজ তাঁর ভাগনে হৃদয়ের হাতে দিয়ে গেল। ভাগনেকে ডেকে বললেন—"হ্যাঁরে হৃদে, তোর হাতে মারোয়াড়ী কি দিয়ে গেল?" হৃদে ব্যাপারটা চেপে যাবার চেষ্টা করলো। সেতো মামাকে চেনে। একবার যদি মামা জানতে পারে সে মারোয়াড়ীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তবে আর রক্ষা রাখবেন না। তাই সে মামার কাছে টাকার কথাটা লুকোল। কিন্তু মামাও ছাড়ার পাত্র নন। বললেন, "শিগগীর বল নইলে ভাল হবে না।"

তখন হৃদে বললে, "মারোয়াড়ী দশ হাজার টাকা প্রণামী দিয়ে গেছে।" শুনে সাধুটি চম্‌কে উঠলেন, যেন তাঁকে কাঁকড়া বিছে কামড়েছে। বললেন, "ওরে হৃদে এখুনি যা টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়।" হৃদে কি যেতে চায় হাতে পেয়েছে নগদ দশটি হাজার টাকা। সোজা ব্যাপার নয়। এ টাকায় কিনা হয়। ধানজমি, গরু, বাড়ী। কাজেই হৃদেও যাবে না। শেষে মামা বললেন, "দ্যাখ হৃদে যদি টাকা ফেরৎ নাদিস তাহলে সেজবাবুকে বলে তোকে এখান থেকে তাড়াব।" হৃদে আর কি করে ছুটে গিয়ে মারোয়াড়ীকে ধরল। মারোয়াড়ী তখনও মন্দির ছেড়ে বেশী দূর যাননি। তিনি ব্যাপার শুনে তো অবাক। এ কেমন সাধু, টাকা দিলে নেয় না। ভাবলেন হয়তো প্রণামীর পরিমাণ মনোমত হয়নি বলে সাধু নিতে চাননি। ছুটে এসে সাধুকে আরও বেশী টাকা দেবার জন্য জেদাজেদি আরম্ভ করলেন। কিন্তু সাধুটি কিছুতেই টাকা নিতে রাজি হলেন না। কারণ টাকা নিয়েই সংসারে নানা গোলমাল।

এই সাধুটিকে রানী রাসমণির জামাই মথুরবাবু ভারি ভালবাসতেন। একবার তাঁর ইচ্ছে হল সাধুটিকে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি তীর্থদর্শন করাবেন। গঙ্গায় নৌকা করে চলেছেন, পথে এক জায়গায় নৌকা বেঁধে আহারাদি সারছেন এমন সময় সেই অঞ্চলের গরীব দুঃখী মানুষেরা চারিদিকে ভীড় করে দাঁড়ালো। সাধুটি দেখলেন, না খেয়ে খেয়ে দেহ তাদের শীর্ণ, তেলের অভাবে গায়ে খড়ি ফুটছে, মাথার চুল-গুলো রুক্ষ, পরণে নেংটি সার। সাধুটি মথুরবাবুকে ধরে বসলেন, এদের সবাইকে পেটভরে খাওয়াতে হবে আর দিতে হবে একখানি করে নতুন কাপড়। মথুরবাবু বললেন, তা কি করে হয় হিসেব করে টাকাকড়ি নিয়ে বেরিয়েছি এখন খরচার ধাক্কায় পড়লে তীর্থদর্শন আর হবে না। সাধুটি বললেন, দরকার নেই বাপু আমার তীর্থ দর্শনে। তুমি বাপু এদের খাওয়াও, পরাও তাতেই আমার তীর্থদর্শনের পুণ্য হবে। মথুরবাবু আর কি করেন সেই গরীব দুঃখী মানুষদের জন্য বেশ মোটা টাকা খরচ করলেন।

সৎ, নির্লোভ ও জ্ঞানী সাধুটির কথা ক্রমে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁর সরল, মধুর কথা শোনার জন্য কলকাতা থেকে

আসতে শুরু করেন সেকালের সেরা মানুষেরা। আসেন বিখ্যাত বক্তা ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন, আসেন শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আরও সব বিখ্যাত বড় বড় লোক। শোনা যায় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তেরও নাকি এই সাধুটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই সাধুটির হয়েছিল অনেক কথাবার্তা। ভারতীয় বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠাতা সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এই সরল সাধুটিকে।

সাধুটির উপদেশ দেবার নিয়ম ছিল ভারি চমৎকার। কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল না। তাঁর মতে সব ধর্মেই সত্য আছে। হিন্দুরা যাকে বলে 'জল' খ্রীস্টান ইংরেজরা তাকেই বলে 'ওয়াটার' আর মুসলমানেরা তাকেই বলে 'পানি'। তবে আর বিরোধ কোথায়? তাঁর মতে মানুষের মধ্যেই নারায়ণ আছেন, দুঃখী মানুষকে সেবা করলেই ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। এই কথাটাই তাঁর সেরা শিষ্য বিবেকানন্দ কবিতার ছন্দে বলেছেন—

জীবে প্রেম করে যেই জন

সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

সাধুটির কথা ছিল ভারি সহজ, সরল ও গভীর। তিনি বলতেন, "দেখ, খালি পেটে ধর্ম হয় না।" কারণ দেহমন ক্ষুধায় কাতর হলে ঈশ্বরকে একমনে ডাকা সম্ভব নয়। তাই সকলেরই মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সাধুটির চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল যে কাউকেই কোন রূঢ় কথা, কটু কথা বলতেন না। একদিন কথা প্রসঙ্গে কে একজন যেন বলে ফেলেছিল অমুক লোকটি খোঁড়া। সাধুটি বললেন, না না অমন কথা বলতে নেই, বল পাটা মোড়া। কটুকে মিষ্ট, বক্রকে সরল, অন্ধকারকে আলো করার জন্যই সাধুটির আবির্ভাব হয়েছিল এই ভারতে। ভারতবর্ষে তখন পরের অনুকরণ চলছে। ইংরেজী বলা, কোট প্যাণ্ট পরা, বিলাত যাওয়া তখন সকলের আকাঙ্ক্ষা। ভারতবর্ষ যে একটা প্রাচীন সভ্যদেশ, তার যে একটা ধর্ম-সংস্কৃতি আছে তখন সবাই ভুলে গেছে। এই সাধুটি তাঁর

আপন জীবনে আচরণ করে দেশকে বুঝিয়ে দিলেন সত্যকার ধর্ম কি। তাঁর প্রেরণাতেই অসাধারণ বিদ্বান ও প্রতিভাশালী তরুণ নরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে আমেরিকায় গিয়ে বক্তৃতা করে সারা বিশ্বের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

এই সাধুটির মুখের কথাগুলি মহেন্দ্র গুপ্ত নামে এক পণ্ডিত মানুষ ডায়েরী আকারে লিখে রাখেন। সেগুলি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলে সারা-দেশ ধন্য ধন্য করতে থাকে।

এতক্ষণে বোধ করি বোঝা গেল, এই সাধুটি আর কেউ নন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এঁর কাছে শুধু ভারতবর্ষ নয় সারা জগৎ-ই পরম শ্রদ্ধায় প্রণতঃ।

[বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা,
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি,
সেথায় আমার প্রণাম দিলাম আনি।

—রবীন্দ্রনাথ]

প্রেমিক সন্ন্যাসী

আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগের কথা। নবদ্বীপের দুটি ছেলে নৌকায় চলেছে নদীর ওপারে রাজসভায় পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষায় যে ছেলে প্রথম হবে সে পাবে সভাপণ্ডিতের পদ। এর জন্যে তাদের ন্যায়-শাস্ত্রের উপর প্রবন্ধ রচনা করে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এ দুটি ছেলের হাতেই তুলোট কাগজে লেখা প্রবন্ধ রয়েছে। এদের মধ্যে একটি ছেলে বললে, "ভাই নিমাই, তুমি কেমন লিখেছ একটু পড়তো।" নিমাই নামের সুন্দর চেহারার ছেলেটি সলজ্জ হাসিমুখে তার পুঁথিটি পড়তে লাগলো। এদিকে হল কি পাঠ শুনতে শুনতে অন্য ছেলেটির মুখ ম্লান হয়ে এল। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। নিমাই নামে ছেলেটি বন্ধুকে কাঁদতে দেখে অবাক হয়ে বললে, "একি ভাই রঘুনাথ, তুমি কাঁদছ কেন?" রঘুনাথ বললে, "ভাই নিমাই, তোমার এই লেখা শোনার পর প্রবন্ধ বিচারকেরা তোমাকেই প্রথম বলে ঘোষণা করবেন। অন্য কারো লেখা এর কাছে দাঁড়াতেই পারবে না! ভেবেছিলাম আমি সভাপণ্ডিতের পদ পাব। পেলে আমাদের সংসারের দুঃখ ঘুচবে। জানো তো আমরা কত গরীব।" নিমাই বললেন, "ছিঃ, এই জন্যে কাঁদছ আমি পরীক্ষাই দেব না।" বলে হাতের পুঁথিটি গঙ্গার জলে ফেলে দিলেন। "কর কি, কর কি," বলে রঘুনাথ জলে ঝাঁপ দিতে যায় আর কি। বন্ধুকে ধরে ফেললেন নিমাই। রঘুনাথ বললেন, "ভাই নিমাই, তুমি মানুষ না দেবতা!"

এই নিমাই এখন মস্ত পণ্ডিত। টোল খুলেছেন, ছাত্ররা সেখানে পড়া-শোনা করে। সারা দেশ জুড়ে তাঁর কত খ্যাতি, কত যশ। নবদ্বীপে তখন বৈষ্ণবেরা খোল-করতাল নিয়ে রোজ সন্ধ্যাবেলা কীর্তন করেন। নিমাইও এই নিরীহ শান্ত মানুষগুলোর সঙ্গে যোগ দিয়ে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করে আনন্দ পান। এদিকে নবদ্বীপের কতগুলি দুষ্টলোক স্থানীয় চাঁদ কাজীর

কাছে নালিশ করল, খোল-করতালের আওয়াজে তাদের নাকি রাতে ঘুম হয় না, কাজকর্মের বিঘ্ন হয়। কাজী আদেশ দিলেন নাম-সংকীর্তন করা আর চলবে না, খোল-করতাল বাজালে দারুণ শাস্তি দেওয়া হবে। শুনে শান্ত বৈষ্ণবেরা ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা ঠিক করলেন কীর্তন বন্ধ করে দেবেন। নিমাই সব শুনলেন, শুনে বললেন, কখনও না। "সংকীর্তন যেমন চলছে চলুক। কাজীর অন্যায় আদেশ আমি রদ করবই। আজ সন্ধ্যায় নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মেয়েরা প্রদীপ জ্বালাবে, তোমাদের নিয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে হরিনাম করতে করতে চাঁদ কাজীর বাড়ী ঘেরাও করবো।" শুনে প্রথমটা সবাই ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু নিমাইয়ের কাছে ভরসা পেয়ে তাঁরা রাজি হলেন। পরদিন নবদ্বীপের ঘরে ঘরে জেগে উঠলো খোল-করতালের কলরোল। পিল্ পিল্ করে মানুষ বেরিয়ে এল পথে। প্রায় দশহাজার মানুষের মিছিল চলল চাঁদ কাজীর বাড়ীর দিকে। সেই মিছিলের সামনে সুন্দর সুঠাম, দীর্ঘদেহ এক মানুষ। কাঁচা সোনার মত রঙ, টানা টানা বড় চোখে কি বেদনা, কি করুণা, আর কি তীব্র তেজ। মুখে তাঁর অবিরাম হরিধ্বনি। এদিকে চাঁদ কাজীর কানে পৌঁছেছে সব কথা। গৌড়ের নবাব হুশেন শাহের আত্মীয় তিনি। প্রতাপ তাঁর কম নয়। ইচ্ছে করলে তুরক ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না। ভয় পেয়ে নিমাইকে ডেকে পাঠালেন, একটা মিটমাটও করে নিলেন। কারণ তিনি দেখলেন বৈষ্ণবরা অহিংস হলেও তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর বাড়ীতে আগুন দেবার মতলব করছে। তিনি নিমাইয়ের দাবী মেনে নিলেন। ঠিক হল বৈষ্ণবরা যেমন সংকীর্তন করতেন এখন থেকে তেমনিই করতে পারবেন।

এই বিদ্বান তেজী ও পরম রূপবান যুবকটির পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন শ্রীধর ও শুক্লাম্বর বলে দুটি অতি দরিদ্র মানুষ। শ্রীধরের দিন চলতো থোড়, কলা, মোচা বিক্রী করে। আর শুক্লাম্বর ছিলেন ভিখারী। সাধারণতঃ দেখা যায় লোকে ধনী লোক অসৎ হলেও তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে যায়। কিন্তু নিমাই ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। তিনি শ্রীধর ও শুক্লাম্বরকে ভালবাসতেন, তারা সৎ বলে। ছেঁড়া তালি দেওয়া কাপড় পরা শ্রীধরের পাতার কুটিরে গিয়ে ফুটো লোহার গেলাসে করে জল খেতেন। আর ভিখারী শুক্লাম্বরকে তো একবার ভারি বিপদে ফেলেছিলেন। তাঁর

বাড়ীতে যেচে নিমন্ত্রণ নিয়েছিলেন। শুক্লাম্বর আর কি করেন থোড় ভাতে ভাত নিমাইকে খেতে দিয়েছিলেন। পরিতোষ সহকারে নিমাই তা খেয়েছিলেন।

নিমাইয়ের বয়স তখন চব্বিশ। তিনি সমাজ ও সংসারের দিকে চেয়ে বড় কষ্ট পেতেন। দেখতেন বিদেশী তুর্কী শাসনে ও শোষণে দেশের কোথাও শান্তি নেই। উচ্চবর্ণের অত্যাচারে গরীব নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষ কি দুঃখই না পাচ্ছে। দলে দলে তারা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম নিচ্ছে। তিনি ঠিক করলেন দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে হবে কিন্তু ঘরে বসে ভোগ ও বিলাসের মধ্য থেকে তো দেশ সেবা করা যায় না। তাই একদিন সব সুখ, সব ভোগ ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিলেন। কামিয়ে ফেললেন মাথার সুন্দর কালো কোঁকড়ানো চুল, শান্তিপুরের মিহি ধুতি ছেড়ে পরলেন এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া। সন্ন্যাস নেবার আগে ভারি চমৎকার একটা ব্যাপার ঘটলো। নবদ্বীপের অনেকেই নানা সুখাদ্য পাঠিয়েছিল তাঁর খাবার জন্য। ভিখারী শুক্লাম্বর কুণ্ঠাভরে এনেছিলেন একটি লাউ। নিমাই তাঁর মাকে বললেন, "অন্য দামী খাবার খাব না ওই লাউটি রাঁধ ওইটি খেয়েই চিরদিনের জন্য সংসার ছেড়ে যাব। চিরদিন এমনি করে অমানীকে মান দিয়ে গেছেন। ছ বছর ধরে সারা ভারত ঘুরে বেড়ালেন। দেখলেন সারা দেশে মানুষের কি কষ্ট। দেখে চোখের জলে বুক ভেসে গেল। স্থির করলেন এ জাতিকে বাঁচাবেন। তাই ভারতের প্রায় মাঝখানে পুরী তীর্থে স্থির হয়ে বসলেন। সারা-দেশ থেকে সেরা মানুষদের ডাক দিলেন। এলেন গৌড়ের রাজমন্ত্রী রূপ আর সনাতন। তাঁদের পাঠালেন বৃন্দাবনে। নতুন করে হিন্দু তীর্থ গড়ে তুলতে। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের রাজ্যপাল রামানন্দ রায়কে চাকুরী ছাড়িয়ে আনলেন নিজের কাছে আর তাঁর ডানহাত নিত্যানন্দকে পাঠালেন বাংলাদেশে। খড়দহে বসে নিত্যানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করবেন। সপ্তগ্রামের কোটিপতির সন্তান রঘুনাথ দাস তাঁর চরণে আশ্রয় পেলেন। এই শ্রেষ্ঠ মানুষদের নিয়ে আঠারো বছর ধরে নিমাই দেশ, জাতি ও ধর্মকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপাত করলেন।

বোধ হয় তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না এই নিমাইকে। ইনি সেই নদীয়া দুলাল যিনি শ্রীচৈতন্য নামে সারা ভারতে আজও খ্যাতিমান।

[ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

নবযুগের প্রথম মানুষ

বউবাজারের মোড়ে একজন তরকারীওয়ালা তার ভারী মোট মাথায় তুলতে পারছিল না। আশেপাশে অনেককেই সে কাতরভাবে অনুরোধ করছিল, মোটটা তার মাথায় তুলে দেবার জন্যে। কিন্তু কেউ-ই তার কথায় কান না দিয়ে চলে যাচ্ছিল। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে, লম্বা-চওড়া ভারি সুন্দর চেহারার একজন মানুষ, কাছেই শিয়ালদহ স্টেশনের মুটেদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করছিলেন, দৈনিক কত করে তারা রোজগার করে। খাই-খরচে কত ব্যয় হয়, বাড়ীতে ছেলেমেয়ে কজন, কত করে তাদের পাঠাতে হয়—এই সব। সেই মানুষ খানিক-দূর থেকে তরকারীওয়ালাকে দেখে এগিয়ে এলেন। দুহাত বাড়িয়ে মস্ত বোঝা তার মাথায় তুলে দিলেন। গরীব তরকারীওয়ালাটি তো অবাক। এমন ব্যাপার তার জীবনে কখনো ঘটেনি। হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা জানাতে গেল সেই মানুষটি, 'এতো মানুষের কর্তব্য'—বলেই মস্ত এক জুড়ি-গাড়ীতে চড়ে চলে গেলেন।

সেই মানুষটিকেই দেখা গেল মস্ত এক জাহাজ করে চলেছেন বিলাতে। তখন সুয়েজ খাল কাটা হয়নি। আফ্রিকা ঘুরে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে যেতে হত ইংল্যাণ্ড। আফ্রিকার নাটাল বন্দরে ফরাসী জাহাজে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার তেরাঙা পতাকা উড়তে দেখে আনন্দে বিভোর হয়ে সেই পতাকার উদ্দেশ্যে যেই হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাবেন অমনি ডেকে ওঠার সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলেন। ভেঙে গেল তাঁর একটি পা। দারুণ যন্ত্রণা তবু তিনি বললেন, "আমায় নিয়ে চল ডেকের ওপরে, ফরাসীরা বিপ্লবে সফল হয়েছে, আমি জানাব ওদের পতাকাকে অভি-বাদন।" তাই করা হল।

এই আশ্চর্য মানুষটি কেন বিলাত চলেছেন! তখন বিলাত গেলে জাত

যেত। সমাজে এক ঘরে করে রাখা হত। তবু কেন এই দুঃসাহসী মানুষটির বিলাত যাত্রা? এই মানুষটি যখন বয়সে বালকমাত্র তখন হিন্দুসমাজে একটা জঘন্য কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। স্বামী মারা গেলে বিধবাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত। একে বলা হত 'সতীদাহ'। শাস্ত্রে নাকি এর বিধান আছে। বালকটি পাটনায় গিয়ে ইতিমধ্যে আরবি ফারসি পড়ে মস্ত পণ্ডিত হয়েছিলেন। মুসলমান ধর্মশাস্ত্র এমনভাবে পড়েছিলেন যে মুসলমানরা তাঁকে বলতেন 'মৌলবী'। কাশীতে গিয়ে সংস্কৃত শেখেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলি সব পড়ে ফেলেন। ইতিমধ্যে ঘটে যায় একটা ঘটনা। তাঁর বড় ভাই মারা যান। চোখের সামনে অল্পবয়সী বউদিকে পুড়ে মরতে দেখেন। তাঁর মনে হয় 'সতীদাহ প্রথা' অন্যায়। এটি হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্র সঙ্গত নয়। আরও একটা কথা তাঁর মনে হল—ঈশ্বর এক তাঁর বহুরূপ সম্ভব নয়। একথা তিনি শুধু মুখে বললেন না, লিখেও প্রচার করলেন। ফলে সমাজের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উঠলো। তাঁর গোঁড়া বাপ-মাও তাঁকে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের উপদেশ মানলেন না। ফলে তাঁকে ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে হল। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল। চার বছর ধরে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন। শোনা যায়, তিনি তিব্বত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখানে বৌদ্ধ-লামাদের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে কথা বলায় তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়। তিব্বতী মেয়েরাই তাঁর প্রাণ বাঁচায়। এইজন্য নারীজাতির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। এরপর তিনি দেশে ফিরে এসে ডিগবী বলে সাহেবের কাছে কেরাণীগিরি শুরু করেন। এই সাহেবের সাহায্যেই তিনি ভালভাবে ইংরাজী লেখাপড়া শেখেন। ইংরাজী ভাষার মধ্যদিয়ে তিনি ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি বুঝতে পারলেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ছাড়া ভারতবাসী কুসংস্কারমুক্ত হতে পারবে না। তারা মানুষ-রূপেও সভ্যজগতের সঙ্গে এগিয়ে চলতে হবে অপারগ।

তিনি বুঝলেন প্রচুর অর্থ ও অগাধ বিদ্যা ছাড়া তিনি সমাজের অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ধর্মের নামে কদাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন না। আর তাঁকে এই লড়াই চালাতে হবে কলকাতায় বসে। কারণ ইংরেজের তৈরী শহর কলকাতা তখন ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র।

প্রচুর টাকা উপায় করে জমিদারী কিনে কলকাতায় এলেন বেয়াল্লিশ বছরের সেই প্রবীণ মানুষটি। আরবি, ফারসি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত ছাড়া হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী প্রভৃতি প্রায় দশটি ভাষায় তাঁর দক্ষতা জন্মায়। তখন খ্রীস্টান পাদরীরা হিন্দুধর্মের নিন্দা করছিল। সেই মানুষটি একটি ইংরেজী পত্রিকা বার করে তার প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করে দেখিয়ে দেন যথার্থ হিন্দুধর্ম কি। এ ছাড়া বাংলা ভাষায় ও ফারসি ভাষায় আরও দুটি কাগজ প্রকাশ করেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর পত্রিকায় লেখা বার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুসমাজ তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আবার সংস্কৃতের বদলে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য লাটসাহেবকে চিঠি লেখার জন্য অনেকেই তাঁর উপর বিরূপ হন। এর ওপর নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার জন্য ব্রাহ্ম-মন্দির তৈরী করায় বহু শত্রুর সৃষ্টি হয়। সকলেই বলতে থাকে ইনি যে হিন্দুধর্মের এত সমালোচনা করেন, হিন্দুধর্মের ইনি কি জানেন। তাঁর সঙ্গে ধর্ম নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে বাংলাদেশের পণ্ডিতেরা পরাজিত হলেন। তখন মাদ্রাজ থেকে মস্ত পণ্ডিত সুব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীকে আনানো হল কলকাতায়। তিনিও পরাজিত হলেন। খ্রীস্টান পাদরী অ্যাডাম সাহেবও তাঁর কাছে খ্রীস্টধর্ম নিয়ে তর্ক করতে এসে হেরে গিয়ে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়লেন। এইবার এই বিজয়ী পুরুষ সকল বাধা, শত্রুতা ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে তৎকালীন বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সাহায্যে জ্বলন্ত চিতার আগুন থেকে হিন্দু-নারীদের রক্ষা করেন। কিন্তু ভাটপাড়া, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের গোঁড়ারা ছাড়লেন না। তাঁরা 'সতীদাহ রদ' আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে আবেদন করলেন। চিরসংগ্রামী মানুষটি দেখলেন তাঁর এতদিনের চেষ্টা যত্ন সব পণ্ড করে দেবে কতকগুলি নির্বোধ হীন প্রকৃতির লোক, কখনোই নয়। তিনিও বিলাতে পাড়ি দিলেন, 'আলবিয়ন' বলে পালতোলা জাহাজে। দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে দূত নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বিলাতে গিয়ে প্রথমে দেখা করলেন বিখ্যাত মনীষী রসকোর সঙ্গে। রসকো বললেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনার মত মানুষের দর্শন পেলাম।' এর পরেই সেই মানুষটি চলে গেলেন ম্যানচেস্টার শহরের কারখানার দরিদ্র শ্রমিক বস্তীতে। তাদের সঙ্গে কথা বললেন, তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনলেন। সেই গরীব শ্রমিকেরা ভারতীয় রাজার সঙ্গে করমর্দন করতে পেরে অবাক হয়ে

গেল। কারণ তাদের দেশের ধনী ভদ্রলোকরা তো তাদের মানুষ বলেই মনে করে না।

সতীদাহ প্রথা রদ আইন বাতিল করার জন্য যে আবেদন করা হয়েছিল তা এঁরই চেষ্টায় ও যত্নে নাকচ হয়ে যায়। দারুণ দুশ্চিন্তা ও শ্রমে এই মহান মানুষটির শরীর ভেঙে পড়েছিল। বিদেশের মাটিতেই এই অক্লান্ত যোদ্ধার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে।

তোমরা বোধহয় বুঝতে পেরেছো যাঁর কথা বলা হল তিনি ভারত মাতার সেরা ছেলে রাজা রামমোহন রায়।

[হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
মৃত্যু অন্তরাল ভেদি দাও তব অন্তহীন দান,
যাহা কিছু জরাজীর্ণ, তাহাতে জাগাও নবপ্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।

—রবীন্দ্রনাথ]

ধুতিপরা সাহেব

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এক পণ্ডিত সাহেব প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে কদিনের ছুটি চাইলেন। বললেন, "সাহেব, আমার ভায়ের বিয়ে কদিন ছুটি দিতে হবে। দেশে যাব।"

সাহেব বললেন, "তাতো এখন সম্ভব নয় পণ্ডিত। এখন কাজের বড় চাপ, ছুটি দেওয়া এখন সম্ভব হবে না।" পণ্ডিত মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এলেন আবার; হাতে একটা কাগজ। কাগজটা টেবিলের উপর রেখে বললেন, "সাহেব এই আমার পদত্যাগপত্র। চাকরী আমি ছেড়ে দিলুম।" সাহেব তো অবাক। তিনি তো জানেন বাঙালীর ছেলে চাকরী বলতে অজ্ঞান। আর ইনি এক কথায় চাকরী ছেড়ে দিলেন। বললেন, "ব্যাপারকি পণ্ডিত, ভাইয়ের বিয়ে যাবেন বলে চাকরী ছেড়ে দিলেন?" পণ্ডিত বললেন, "না সাহেব, আমার মায়ের আদেশ। ভাইয়ের বিয়েতে আমায় যেতে হবে। চাকরীর চেয়ে মায়ের ইচ্ছা আমার কাছে ঢের বড়।" পণ্ডিতের তেজ আর মাতৃ-ভক্তি দেখে সাহেব ছুটি মঞ্জুর করলেন।

পণ্ডিত পায়ে হেঁটেই চললেন হুগলী জেলার বীরসিংহ (অধুনা মেদিনী-পুর) গ্রামে। তখন বর্ষাকাল। রাস্তায় কাদা, আবার পথে পড়ে দামোদর নদ। পণ্ডিত খেয়াঘাটে এসে দেখলেন নৌকা নেই। নদীর স্রোত পাক খেতে খেতে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। কুটোটি পড়লে টুকরো হয়ে যায় এমন অবস্থা। পণ্ডিত প্রাণের মায়া না করেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। তাঁকে যে যেতেই হবে কারণ মায়ের আদেশ। সাঁতরে ওপারে উঠে কাদা মেখে ভূত হয়ে উপস্থিত হলেন বীরসিংহে মায়ের কাছে।

এ পণ্ডিত সোজা লোক নন। শুধু সংস্কৃত পড়া টুলো পণ্ডিতও নন। রীতিমত ইংরাজী জানা যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল তিনি। একদিন বউবাজারের বাসা বাড়ী থেকে কলেজ যাচ্ছেন, পরণে সাদা থান ধুতি, গায়ে চাদর, পায়ে ঠনঠনের চটি জুতো। হঠাৎ দেখেন পথের পাশে ভীড় জমেছে। কাছে গিয়ে দেখলেন, কালো মত নেংটি

পরা একটি লোক অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করে জানলেন লোকটার কলেরা হয়েছে। ওর কেউ নেই। কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করে লোকটিকে নিজের কাঁধের উপর তুলে নিলেন। সবাই বললে, "করছেন কি পণ্ডিত মশাই, ওর যে কলেরা হয়েছে, সাংঘাতিক রোগ। তার ওপর লোকটা জাতে মেথর।" এ সব কথায় কান না দিয়ে লোকটিকে নিজের বাসা বাড়ীতে নিয়ে এলেন। ভাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জানতেন। চিকিৎসা করে লোকটিকে সারিয়ে তুলে হাতে কিছু টাকা দিয়ে উড়িষ্যায় তার দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

শুধু বিদ্যা নয় শুধু করুণা নয়, এই পণ্ডিতের মত তেজস্বী লোকও খুব কম ছিল তখন। সাহেবদের তখন লোকে ভয় করত যমের মত। সেই সাহেবরাও তাঁকে খাতির না করে পারত না। কেন সেই কথাই বলি শোন। একবার হয়েছে কি পণ্ডিত গিয়েছেন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের ঘরে। সাহেব টেবিলের উপর পা তুলে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। অপমানটা পণ্ডিতের ভারি লাগলো। একদিন হয়েছে কি কার সাহেব একটা সরকারী কাজে এসেছেন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে। প্রিন্সিপাল বলা বাহুল্য, সেই তরুণ পণ্ডিত। পণ্ডিতটি করলেন কি টেবিলের ওপর পা তুলে সাহেবের নাকের ডগায় তালতলার চটি নাচাতে নাচাতে আর ভুড়ুক ভুড়ুক করে হুঁকো টেনে সাহেবের মুখের উপর ধোঁয়া ওড়াতে লাগলেন। সাহেবতো এক 'কালা আদমীর স্পর্ধা দেখে চটে আগুন। নালিশ করলেন শিক্ষা বিভাগের বড় কর্তার কাছে। পণ্ডিতের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হল। পণ্ডিত বললেন "সেকি, আমাদের দেশে অতিথিকে তো 'আসুন বসুন' করে আপ্যায়ন করা হয়। সেদিন কার সাহেব যখন আমার মুখের সামনে জুতো তুলে চুরুট ফুঁকতে লাগলেন তখন ভাবলুম এটাই বুঝি সাহেবদের সভ্য নিয়ম। তাই আমি তাঁর আদব কায়দাটাই অনুকরণ করেছি মাত্র।" কর্তৃপক্ষ বুঝলেন, এ বড় শক্ত ঠাঁই। কার সাহেব পণ্ডিতের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিস্তার পেলেন। পণ্ডিতের মনটি ছিল ভারি নরম। একবার কলকাতা থেকে দেশে গেছেন—রাত্রে কান্নার রোল উঠলো পাড়ায়। মায়ের মুখে শুনলেন পাড়ারই পনেরো বছরের একটি ছোট মেয়ে বিধবা হয়েছে। শুনে পণ্ডিতের মন ভারি খারাপ হয়ে গেল। তিনি তো জানেন হিন্দু ঘরের মেয়ে বিধবা হলে তার চুল কেটে ফেলা হবে, শাড়ী

গয়না খুলে নিয়ে থান কাপড় পরানো হবে, আর মাছ-মাংস খাবার অধিকার তার থাকবে না। একবেলা নিরামিষ ভাতে-ভাত হবে তার আহার। একাদশীতে ভাত তো দূরের কথা জলটুকুও খেতে পারবে না। পণ্ডিত বেদনায় ম্লান হয়ে গেলেন। তাঁর মা বললেন, "হ্যাঁরে তুইতো এত পণ্ডিত, সব শাস্ত্রই তো পড়েছিস, শাস্ত্রে কি বিধবার বিয়ের কি কোন বিধান নেই?" কথাটা পণ্ডিতের মনে লাগলো। রাত জেগে নানা শাস্ত্র ঘেঁটে তিনি দেখলেন বিধবাদের বিয়ে দেওয়া শাস্ত্র-সঙ্গত। তখন তিনি বই ছাপিয়ে নানা যুক্তি দেখিয়ে দেশের লোককে বোঝাবার চেষ্টা করলেন বিধবাদের বিয়ে দেওয়া উচিত। ফলে গোঁড়া বামুনরা খুব চটে গেল। তারা সেই পণ্ডিতকে মেরে ফেলবারও চেষ্টা করলো। কিন্তু সেই পণ্ডিত প্রচণ্ড আন্দোলন করে বিধবা-বিবাহ আইন পাস করিয়ে ছাড়লেন।

আশ্চর্য মানুষ এই পণ্ডিত। অগাধ পাণ্ডিত্য। ইচ্ছা করলেই বড় বড় সংস্কৃত কাব্য লিখে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারতেন। তা না করে লিখলেন বর্ণপরিচয়, কথামালা—যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই বাঙ্‌লা ভাষাটা শিখতে পারে। সরকারী চাকরীর প্রতি লোভ আজও লোকের যায়নি। কিন্তু এই নির্ভীক পণ্ডিত এক কথায় পাঁচশো টাকা মাইনের সরকারী চাকরী ছেড়ে দিতে ভয় পাননি। বই লিখে মাসে আয় করতেন পাঁচ হাজার টাকার উপর। সেসব টাকা গরীব-দুঃখী মানুষকে অকাতরে দান করে দিতেন।

কবি মাইকেল মধুসূদন বিদেশে গিয়ে টাকার অভাবে জেলে যেতে বসেছিলেন। এই পণ্ডিত সেদিন টাকা ধার করে মধুসূদনকে পাঠিয়ে-ছিলেন, তবেই তিনি রক্ষা পান।

তোমাদের বোধ হয় বলে দিতে হবে না এত বড় বিদ্বান, তেজস্বী মাতৃভক্ত দয়ার সাগর মানুষটি কে? ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অগাধ বিদ্যার কথা মনে রেখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকেরা তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'বিদ্যাসাগর'।

[সাগরে যে অগ্নি থাকে
কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর
হয়েছে প্রত্যয়। —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

স্বদেশ প্রেমিক সন্ন্যাসী

আমেরিকার মস্ত এক শহরে ষাট তলা এক প্রকাণ্ড হোটেল। সেই হোটেলের একটি ঘর। ঘরে পাখীর পালকের দামী বিছানা। এক তরুণ সন্ন্যাসী সেই বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। কিন্তু শুতে পাচ্ছেন না। কেমন যেন ছট্‌ফট্‌ করছেন, ঘরের মধ্যে পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, আমি এখানে ভাল ভাল খাবার খেয়ে, পাখীর পালকের বিছানায় শুয়ে ঘুমাবো আর এই দারুণ শীতে কলকাতার ফুটপাথে আমারি দেশের গরীব ভাইবোনেরা ঠাণ্ডায় কাঁপবে হি হি করে। ক্ষুধার জ্বালায় কুঁকড়ে শুয়ে থাকবে। ভেবে সন্ন্যাসীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। তিনি বিছানায় না শুয়ে ঘরের মেঝেয় শুয়ে রাত কাটালেন। অথচ তখন তিনি আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ। কলকাতা থেকে তিনি আমেরিকার শিকাগো নগরে এসেছিলেন বিশ্বধর্ম সভায় যোগ দিতে।

কলকাতার সিমলা অঞ্চলের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্ম এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর স্বভাবটা একটু অন্য ধরনের। বাবার বৈঠকখানায় সাজানো থাকতো নানা ধরনের হুঁকো। কোনটা ব্রাহ্মণের, কোনটা কায়স্থের, কোনটা শূদ্রের, কোনটা মুসলমান বা অন্য জাতের। তখন কথায় কথায় জাত যেত। তাই এক দলের হুঁকা অন্য দল খেত না। সন্ন্যাসী তখন বালক। তাঁর মনে হোত, বারে এ কেমন ব্যাপার, মানুষে মানুষে ভেদ আছে কি, দেখি তো জাত যায় কেমন করে বলে সব হুঁকোতে একবার করে মুখ দিতেন।

বলেছি তো ছেলেটি একটু অন্য ধরনের, সবাই তখন চায় বি. এ. পাস করে উকিল কি ডেপুটী হতে। কিন্তু এই ছেলেটি সেসব কিছুই হতে চাইলেন না। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য হলেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, স্বার্থপর না হতে। বললেন, "তুই হবি একটা বটগাছের মত। কত দুঃখী আতুর তোর কাছে আশ্রয় নেবে।"

আজ থেকে একশ বছর আগে তোমরা তো জান আমাদের দেশটা

ছিল পরাধীন। শাসন করত, শোষণ করত বিদেশী বণিক জাতি ইংরেজ। ভারতবর্ষ কত বড় ছিল—সেসব কথা ভুলে সবাই কোট-প্যান্ট পরে নকল সাহেব সাজত। ইংরেজীতে কথা বলাকে গর্বের মনে করত আর বিলাত যাওয়া ছিল সকলের লোভের ব্যাপার। আর হিন্দুধর্মের নিন্দা করাটা ছিল ফ্যাশান। এমনি সময় দক্ষিণেশ্বরের সাধু শ্রীরামকৃষ্ণ জাতি ও ধর্মকে বাঁচাবার জন্যে যেন দেশের তরুণ সমাজকে ডাক দিলেন। সেই ডাকে সাড়া দিলেন সিমলার সেই ছেলেটি। দেশকে ভালভাবে জানার জন্যে সন্ন্যাসীর বেশে প্রায় ছ'বছর ধরে ভারতের পথে পথে ঘুরলেন। দেখলেন ক্ষুধায় কাঁদছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। শীতে হি হি কাঁপছে, পরণে তাদের পরবার মত আস্ত একখানা কাপড়ও জোটে না। দেখেন আর সন্ন্যাসীর চোখে জল পড়ে। কেবলই মনে পড়ে তাঁর গুরুর কথা.—ওরে খালি-পেটে ধর্ম হয় না। তিনি বুঝতে পারেন, ভারতের এই লক্ষ লক্ষ না-খেতে পাওয়া মানুষই তাঁর ঈশ্বর। জীবের সেবাই শিবের সেবা। এই দেশ ও জাতিকে জগৎ সভায় মর্যাদার আসনে বসাতে হবে।

এই সময় আমেরিকার শিকাগো নগরে সমস্ত পৃথিবীর ধর্মগুলির এক সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। আশ্চর্যব কথা—ছোটখাট অনেক ধর্ম-সম্প্রদায় এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ পায় কিন্তু হিন্দু ধর্মের কোন প্রতিনিধিকে ডাকাই হয় না। এই তরুণ সন্ন্যাসী নানা বাধা কাটিয়ে হাজির হন শিকাগো নগরে। সহায় নেই, সম্বল নেই, পকেটে নেই টাকা পয়সা। তার ওপর দারুণ শীত। গরম জামা কাপড়েরও অভাব। সেদিন সেই দূরদেশে এই তরুণ সন্ন্যাসীর মৃত্যু হতে পারত। ক্লান্ত হয়ে পথের পাশে ফুটপাতে বসে পড়েছেন। এমনি সময়ে সামনের বাড়ীর এক মহিলা ঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁরই সাহায্যে বিশ্বধর্ম সভায় যোগ দেবার অধিকার পেলেন এই তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসী। তারপর যা ঘটলো এক অলৌকিক ব্যাপার বললেই হয়।

শিকাগোর বিশ্বধর্ম সভায় একের পর এক বক্তৃতা করে গেলেন খ্রীস্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের প্রতিনিধিরা। বক্তৃতায় শ্রোতারা বিশেষ রকম আগ্রহ দেখালেন না। কিন্তু যেই গেরুয়া কাপড় পরা তেজী চেহারার ত্রিশ বছরের তরুণ সন্ন্যাসী বক্তৃতা দিতে উঠলেন, অমনি সবাই আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে দেখলেন অপরূপ কান্তিমান সন্ন্যাসীর দিকে। আর যেই সেই সন্ন্যাসী শ্রোতাদের সম্বোধন করলেন "আমেরিকার

ভাইবোনেরা" বলে অমনি হাততালির শব্দে হলঘর কেঁপে উঠলো। তারপরে নদীর ধারার মত তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো ভারতীয় ভাবধারার সুন্দর সুমধুর কথা। বিমোহিত হল শ্রোতারা। একদিনেই সেই ভারতীয় সন্ন্যাসী বিখ্যাত হয়ে গেলেন। সারা আমেরিকা ঘুরে ঘুরে প্রচার করতে লাগলেন ভারতের বেদান্তধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। এলেন ইংল্যাণ্ড, এখানেও সেই একই কাজ। বহু শত বছরের পর ভারতের নামটি আবার সারা জগতের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন, ভারত পরাধীন হলেও যার অতীত এত ঐশ্বর্যে ভরা সে একদিন স্বাধীন হবেই, জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে।

সত্য কথাই। এই সন্ন্যাসীর ত্যাগের কর্মের আদর্শ নিয়ে দলে দলে তরুণেরা দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে ক্ষুদিরাম, কানাইলালের মত ত্যাগী ছেলেরা হাসিমুখে ফাঁসী যায়। কেউ বা মুচি, মেথর, হাড়ি বলে যাদের তাচ্ছিল্য করা হয় তাদের সেবায় এগিয়ে যায়। বলতে গেলে এই ভারতীয় সন্ন্যাসীই প্রথম দুঃখী মানুষ তথাকথিত নিচু জাতের মানুষকে ভাই বলে, আমার রক্ত বলে প্রথম বুকে টেনে নেন। মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে হাজার বছরের কাজ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও তাঁর আদর্শ আজও ভারতের আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

তোমাদের কি বলে দিতে হবে এই ভারতীয় সন্ন্যাসী কে? ইনি ভুবনবিজয়ী বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

[সন্ন্যাসী সে জীবনমুক্ত
চায়নি তবু নিজের মোক্ষ,
বিশ্বে যত দুঃখ বাধা
নিল পেতে আপন বক্ষ।

সব জড়তা শঙ্কা ছেদন
গৈরিকে তার বিজয়কেতন,
এই ভারতের ধ্যানের মন্ত্র
নিখিলকে সে যে দীক্ষা দিল।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র]

স্বাধীনতা সংগ্রামী যোগী

সেদিন আলীপুরের জর্জকোর্টে লোকের বড় ভীড়। দেশবিখ্যাত এক মহাপণ্ডিত মানুষকে আসামীর কাঠগড়ায় ওঠানো হয়েছে। তাঁর বিচার হবে। তিনি নাকি ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য এক বিপ্লবী দল তৈরী করেছেন। আর সেই দলের ছেলে ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকী অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারতে বোমা ছুঁড়েছে।

এজলাসে বসে সাহেব জর্জ আসামীর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। আরে, ইনি যে বিলাতে তাঁরই সহপাঠী। পরীক্ষায় ইনি হয়েছিলেন প্রথম আর জর্জ সাহেব স্বয়ং হয়েছিলেন দ্বিতীয়।

কাঠগড়ার আসামী, চেহারা সাধারণ বাঙালীর মতই। পাতলা একহারা চেহারা, চুল একটু লম্বা, অল্প দাড়িও আছে। বয়স কত আর হবে। এই পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ। কিন্তু কপালে ও চোখে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভার ছাপ। হবে নাই বা কেন, তাঁর আপন দাদামশাই মানে মায়ের বাবা সেকালের বিখ্যাত মানুষ রাজনারায়ণ বসু আর বাবা বিলাত ফেরত এম. ডি. ডাক্তার। আসামীর জন্ম কলকাতাতে হলেও তাঁর যখন সাত বছর বয়স তাঁকে আর দু'ভাইয়ের সঙ্গে বিলাত পাঠান হয়। সেখানেই এই বিচিত্র আসামীর লেখাপড়া। পরীক্ষায় প্রতি বছর প্রথম হয়ে পেতেন মেডেল, বই, আর টাকা। ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষাটা খুব ভাল রকমই শিখেছিলেন। তাতে কবিতাও লিখতে পারতেন। তাঁর বাবা চাইতেন ছেলে আই. সি. এস. হবে। পাকা সাহেব হয়ে দেশে ফিরবে। হবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তাই এদেশের খবরের কাগজ থেকে নানা খবরের কাটিং পাঠাতেন ছেলেদের কাছে। ফল হল উল্টো। গরীব দেশের দুঃখী মানুষদের কথা জেনে ছেলেটির মনে দেশের প্রতি ভালবাসা জেগে উঠলো।

এদিকে বাবার আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় ঠিকমত টাকা পয়সা পাঠাতে পারতেন না। ফলে তিন ভাই দারুণ কষ্টে পড়ে। এই সময় তাঁরা সামান্য রুটি মাখন খেয়ে এক বছর কাটিয়ে ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করলো, ছেলেটি পেল মোটা টাকার বৃত্তি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। তিন বছরের কঠিন পরীক্ষা দু'বছরেই পাস করলেন প্রথম শ্রেণী পেয়ে। আবার সঙ্গে সঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষাও দিলেন। ভালভাবে পাসও করলেন। কিন্তু তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন ইংরেজের গোলামী করবেন না। তাই ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষার দিন উপস্থিতই হলেন না। কাজেই নিয়ম অনুযায়ী তিনি আই. সি. এস.-এর চাকুরীর যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন না। ছেলেটি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তিনি জানতেন নীরস ফাইল পড়া ও লেখার সামান্য কাজ করার জন্য তিনি জন্মাননি।

সে সময় বরোদার মহারাজা ছিলেন বিলাতে। তিনি সাগ্রহে এই নানা বিদ্যায় পারদর্শী তরুণ যুবাকে নিয়ে গেলেন বরোদায়। বরোদা কলেজে তিনি হলেন ফরাসী ও ইংরাজীর অধ্যাপক। শেষে হলেন ভাইস প্রিন্সিপাল। মাইনে হল সাড়ে সাতশো টাকা। সেকালের পক্ষে অনেক টাকা। বরোদায় বসে সংস্কৃতটা ভাল ভাবে শিখলেন। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, গীতা, কালিদাসের মহাকাব্য ভালভাবেই আয়ত্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুজরাটী, মারাঠী ভাষাটাও শিখে ফেললেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল দেশবিদেশের এত ভাষা জানেন, বাঙালীর ছেলে হয়ে বাঙলাটাই ভাল জানেন না। তাই বাঙলা ভাষা ভাল করে শেখার জন্য দীনেন্দ্রকুমার রায় বলে সেকালের এক নামী সাহিত্যিককে বাঙলা দেশ থেকে নিয়ে আসেন।

অবসর সময়ে এই শান্ত লাজুক অধ্যাপকটি কবিতা লিখতেন। মহাভারতের সাবিত্রী সত্যবানকে নিয়ে ইংরেজীতে একটি মহাকাব্য রচনা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম গানটি তাঁর বড় ভাল লাগতো। এই সময় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বলবান বাঙালী যুবা তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। উদ্দেশ্য বরোদার ফৌজে ঢুকে যুদ্ধবিদ্যা শেখা। বাঙালীকে ফৌজে নেবে না, তাই তাঁর নাম পাল্টে

অরবিন্দ তাঁকে পদাতিক সৈন্যরূপে ফৌজে ভর্তি করালেন। বছর খানেক পরে তাঁকে অরবিন্দ পাঠালেন বাঙলায়। যতীন্দ্র বাঙলায় ফিরে বিপ্লবের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। বরোদায় বসে সেই অধ্যাপক সারাদেশে বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে লাগলেন। এক মারাঠী যুবককে বোমা তৈরী করা শিখতে ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে ইউরোপ পাঠালেন। একটি প্রতিভাবান ছাত্রের জীবনে আস্তে আস্তে কেমন পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। প্রথমে তিনি জ্ঞান তপস্বী নানা ভাষাবিদ অধ্যাপক। কবিতা রচনা ও কাব্য নিয়ে মশগুল। তারপর দেখা গেল শান্ত, নিশ্চিন্ত ভোগ সুখের জীবন ছেড়ে যাত্রা করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপদ্জনক পথে। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান তখন দেশের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। "তোমরা যে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত"—এ কথা এই তরুণ অধ্যাপকের জীবনে সত্য হয়ে উঠলো। তিনি দেশের জন্য আত্মদানের সঙ্কল্প নিলেন।

অরবিন্দ সুযোগ খুঁজছিলেন বাঙলা দেশে আসার। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বাঙলায় জাতীয়তার জাগরণ হয়। তৈরী হয় জাতীয় মহাবিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে বাঙলায় আসেন অরবিন্দ। বরোদায় তাঁর বেতন ছিল সাড়ে সাতশো টাকা, এখানে মাত্র দেড়শত টাকা বেতন হল তাঁর।

এরপরের ইতিহাস ভারি বিচিত্র। এই অধ্যাপকের প্রেরণায় বাঙলায় গড়ে উঠলো বিপ্লবী সমিতি। একাজে তাঁর প্রধান সাহায্যকারী হলেন তাঁর ছোট ভাই বারীন্দ্র ঘোষ। একটি গুপ্ত বিপ্লবী সভাও তৈরী হল। বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা হলেন তার সদস্যা। স্বাধীনতার বাণী বাঙলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য বেরুলো 'যুগান্তর' পত্রিকা। বাঙলাটা তখন ভালভাবেই শিখেছেন অধ্যাপক। অপূর্ব সুন্দর বাঙলায় যুগান্তরে তিনি লিখতেন।

ইতিমধ্যে বাঙালীর একতাকে দুর্বল করার জন্য বঙ্গভঙ্গ করলেন লর্ড কার্জন। বড়লাটের এই হীন কাজের প্রতিবাদে বাঙালী গর্জন করে উঠলো! এই তরুণ অধ্যাপক ঠিক করলেন—এর সমুচিত জবাব দিতে হবে। তারই ফলে অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম, অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে ফাঁসী যায়। বিপ্লবীদল ধরা পড়ে যায়। তার নেতা অধ্যাপককে পুলিশে গ্রেফতার করে। তারই বিচার হয় আলীপুরে।

বিচারে অধ্যাপকের সহকারী দেশপ্রেমিকদের কারও হয় দূর আন্দামান দ্বীপে নির্বাসন, কারও বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। অধ্যাপক কিন্তু ছাড়া পেয়ে যান। অবশ্য তাঁকে কারামুক্ত করার কৃতিত্ব ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের। দীর্ঘ এক বছর ধরে বিনা ফিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে অরবিন্দকে জেল থেকে বাইরে নিয়ে আসেন।

এবার তিনি কর্মযোগীন নামে সংবাদপত্র সম্পাদনা শুরু করেন। ভগিনী নিবেদিতা গোপনে তাঁকে জানালেন ইংরাজ সরকার তাঁকে শীঘ্রই নির্বাসনে পাঠাবে। তাই ভারতবর্ষ ত্যাগ করে তাঁর চলে যাওয়াই ভাল। সেই অধ্যাপক তখন গোপনে রাত্রির অন্ধকারে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে চলে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। তারপর সেখান থেকে ডুপ্লে বলে একটি জাহাজে করে যাত্রা করেন পণ্ডিচেরীতে। শুরু হয় নতুন জীবন। গড়ে ওঠে পণ্ডিচেরী আশ্রম। সেই আশ্রমে বিপ্লবী অধ্যাপক রূপান্তরিত হন যোগী সাধকে। তাঁর সাধনা ভগবৎ চেতনাকে উর্ধ্ব থেকে নামিয়ে এনে মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা। যার ফলে জগৎ সংসারের সকল হিংসা দ্বন্দ্ব দূর হয়ে মানুষ হয়ে উঠবে দেবমানব। এ সব কথা তোমরা বড় হয়ে জানতে পারবে।

এতক্ষণ যে মহা সাধক মনীষীর কথা বলা হল নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো তিনি এই বাঙালীরই ছেলে শ্রীঅরবিন্দ।

['হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান
নহে ধন নহে সুখ। কোন ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা। ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি।

—রবীন্দ্রনাথ]

জগৎজয়ী বিজ্ঞানী

ফরাসী দেশের বিখ্যাত প্যারী নগরীতে প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। সারা পৃথিবীর সেরা পণ্ডিতেরা সমবেত হয়েছেন এখানে। আপন আপন গুণপনা দেখিয়ে নিজের দেশের মুখোজ্জ্বল করবেন। ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন এক তরুণ বৈজ্ঞানিক। উদ্ভিদ দেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের নানা বিচিত্র পরীক্ষা দেখিয়ে সকলকে অবাক করে দিলেন। যে সব সাহেব বৈজ্ঞানিক তাঁর ভুল দেখিয়ে তাঁকে অপদস্থ করবার জন্য এসেছিলেন তাঁরাও এগিয়ে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। সেই প্রদর্শনীতে ভারতের আর এক সুসন্তান স্বামী বিবেকানন্দও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর এই গৌরবে প্রীত হয়ে সেই বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্যে সাধুবাদ জানান।

এই বৈজ্ঞানিকের বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু মনেপ্রাণে ছিলেন খাঁটি বাঙালী। তাই ছেলেকে গ্রামের বাঙলা ইস্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। তাঁর বাবার এক বন্ধু বলেছিলেন, "ওখানে তো ইংরাজী ভাল পড়ান হয় না, ইংরাজী ভাল না শিখলে যে জজ ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী পাওয়া যাবে না। তাঁর বাবা বলেছিলেন, "প্রত্যেক বাঙালী ছেলের উচিত নিজের মাতৃভাষাটা ভাল করে শেখা। নিজের মাতৃভাষাটা যে ভালভাবে না শেখে সে দেশকে ভালবাসতে পারে না। আর চাকরী? আমার ছেলে ইংরাজী পড়ে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হোক এ আমি চাই না।" ফরিদপুরে বেশ ভাল ইংরাজী স্কুল ছিল। সে স্কুলে পড়ত ধনীঘরের আর সরকারী চাকুরেদের ছেলেরা। কেরানী চাপরাশী চাষী আর জেলেদের ঘরের ছেলেরা পড়ত বাঙলা স্কুলে। ফরিদপুরের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসুর ছেলের একপাশে বসতো তাঁর মুসলমান চাপরাশীর ছেলে, আর একপাশে বসতো এক জেলের ছেলে। নিজের দেশ ও দেশের গরীব-দুঃখী মানুষদের ভালবাসার শিক্ষা এইভাবেই ছেলেটি পেয়েছিল। ছেলেটি ঠাকুরমার মুখে শুনতেন মহাভারত, রামায়ণের গল্প। ভারী ভাল লাগত কর্ণ চরিত্রটি। কত উদার, কত মহৎ অথচ

ভাগ্যের হাতে কত আঘাতই না পেয়েছেন। কর্ণ চরিত্রের মধ্যে নিজের বাবাকে দেখতে পেতেন। একদিকে কত কঠোর কত সাহসী, আবার কত কোমল আর ক্ষমাশীল। ঘোড়ায় চড়ে বন্দুক হাতে ডাকাতদের ঘাঁটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বামাল সমেত ধরে ফেলতেন। একবার এক ডাকাতকে জেলে পাঠালেন। জেল থেকে বেরিয়ে ডাকাত কেঁদে পড়লো ভগবানচন্দ্রের পায়ে। বললে, "বাবু খেতে না পেয়ে মারা যাব—যদি একটা কাজকর্ম না দেন।" মমতায় গলে গেলেন ভগবানচন্দ্র। তাঁর ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেবার ভার পেল সেই দুর্দান্ত ডাকাত। ভাল ব্যবহার পেয়ে একেবারে বদলে গিয়েছিল লোকটা। একবার পৈতৃক গ্রাম বিক্রমপুরের রবিঢ় খালে সপরিবারে নৌকায় যাচ্ছিলেন ভগবানচন্দ্র। জলদস্যুরা আক্রমণ করে তাঁর নৌকা। তখন সেই ডাকাত-ভৃত্য প্রাণের মায়া না করে একা লড়ে প্রভুকে বাঁচিয়েছিল। এ সব দেখে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন সেই ছোট্ট ছেলেটি।

অল্প বয়স থেকে নানা বিষয়ে ছেলেটির কৌতূহল। বাবাকে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তোলেন।

"হ্যাঁ বাবা ঝোপের মাঝে জোনাকি জ্বলে, ওরা আলো পায় কোথায় ?

"নদীর জল কোথায় যায় ?"

"আকাশে কত তারা" ?

"আচ্ছা বাবা ছোট গাছ বড় হয় কেন ?"

"ফুল থেকে ফল হয় কেমন করে ?"

বাবা ভগবানচন্দ্র বিরক্ত হন না। যথাসাধ্য জবাব দেন। বলেন,—

"তুমি বড় হয়ে এ সব প্রশ্নের জবাব বার কোর।"

ছেলেটি লেখাপড়ায় বরাবর ভাল। এদেশের শিক্ষা শেষ করে বিলাত যান। বাবা বলেছিলেন,"দেখ যেন নকল সাহেব হয়ে ফিরোনা। বিজ্ঞান বা কারিগরী কিছু বিদ্যা শিখে এসে দেশের মানুষের যাতে উপকার হয় তাই কোর।"

বিজ্ঞানের উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরলেন এক তরুণ যুবা। অধ্যাপনা নিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। মাইনে নিতে গিয়ে দেখলেন, সাহেব অধ্যাপকদের বেতনের অর্ধেক মাত্র তাঁকে দেওয়া হচ্ছে। অপমানিত হয়ে সে বেতন তিনি নিলেন না। অথচ কলেজে ছেলেদের পড়িয়ে যেতে লাগলেন। পদার্থবিদ্যায় তাঁর গবেষণার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে

পড়ে। ফলে বিদেশী ইংরাজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাহেব অধ্যাপকদের সমান বেতন দিতে বাধ্য হয়।

তোমরা রেডিওতে খবর শোন, গান শোন, টেলিভিশনে নাটকের অভিনয় দেখ। এসবই সম্ভব হয়েছে বিদ্যুতের সাহায্যে। বিনা তারে খবর পাঠানোর যন্ত্র কিন্তু এই তরুণ বৈজ্ঞানিকটি আবিষ্কার করেন। বিদ্যুতের ঢেউ যে বহু দূরে সংবাদ বয়ে নিয়ে যেতে পারে এই তরুণ বৈজ্ঞানিক তা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করে দেন। গঙ্গার বুকে এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে বিদ্যুৎ তরঙ্গের দ্বারা খবর পাঠালেন এই তরুণ বৈজ্ঞানিক। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। কিন্তু বিদ্যুৎ তরঙ্গ পাঠাবার ও ধরবার যন্ত্র তৈরীর কৌশল তিনি গোপন করেননি। ফলে ইটালী দেশের এক ইঞ্জিনীয়ার মার্কনি তাঁরই কৌশল অনুসরণ করে উচ্চমানের রেডিও যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেন। ফলে সাধারণ লোকে মার্কনিকেই রেডিওর আবিষ্কর্তা বলে জানে।

ঘটনাটি তরুণ বৈজ্ঞানিকের মনে বড়ই আঘাত দেয়। তিনি তখন পদার্থ বিদ্যার জগৎ ছেড়ে উদ্ভিদ বিদ্যার জগতে চলে যান। গাছপালা, ফুল নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। গাছেদের কেমন করে বৃদ্ধি হয়, তারা যে আঘাতে বেদনা পায়—এই সব বিচিত্র তথ্য পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন।

দেশবিদেশের অনেক যশ, অনেক সম্মান তিনি লাভ করেন। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালী তরুণেরা চাকরীর মোহ ছেড়ে বিজ্ঞান সাধনায় এগিয়ে আসুক। তাই তাঁর আজীবনের সঞ্চয় দিয়ে গড়ে তোলেন 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। আজও এখানে তরুণ বিজ্ঞানীরা সাধকের মত বিজ্ঞান তপস্যা করে চলেছেন।

ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী এই সুসন্তান যে জগদীশচন্দ্র বসু তা বোধ হয় তোমাদের বলে দিতে হবে না।

[বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধু তীরে,—
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি, জয়মাল্যখানি
সেথা যত আনি—
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে। —রবীন্দ্রনাথ]

বিজ্ঞান তপস্বী

মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ ডেকে পাঠালেন বি. এ. ক্লাশের একটি ছাত্রকে। আঠারো-উনিশ বছরের রোগা কালো মত একটি ছেলে অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকে তাঁকে নমস্কার করতে অধ্যক্ষ সেদিনকার ইংরেজী খবরের কাগজটি তার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "দেখতো, এই প্রফুল্ল রায় কি তুমি? এবারে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়েছে। ছাত্রটি সলজ্জে স্বীকার করলেন তিনিই প্রফুল্ল রায়। গোপনে এই কঠিন বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পরীক্ষাটা সত্যিই শক্ত। কারণ এই পরীক্ষা দিতে হলে ইংরাজী ছাড়া সংস্কৃত, ফরাসী বা জার্মান ভাষা জানা দরকার। তাছাড়া ছেলেটি তখনও বি. এ. পাশও করেননি। এফ. এ. পরীক্ষার ফলও খুব ভাল হয়নি। কাজেই তাঁর পক্ষে এই বৃত্তি পাওয়া খুব সহজ ছিল না। খবরের কাগজ থেকে জানা গেল সারা পৃথিবীর সেরা ছাত্রদের হারিয়ে ভারত থেকে দু'জন ছাত্র এ পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। তার মধ্যে একজন বোম্বাইয়ের এক পার্শী ছাত্র, অন্য-জন বাঙালী প্রফুল্ল রায়।

প্রফুল্ল রায়ের বাবা হরিশচন্দ্র রায় ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু। বিদ্যাসাগরের আদর্শে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিধবা বিবাহ দেবার চেষ্টা করায় গ্রামের লোকেরা তাঁর শত্রু হয়ে ওঠে। তিনি গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হন। বিদ্যাসাগরের মতই তিনি সাধারণ বাঙালীর মত ধুতি চাদর পরতেন। প্রফুল্ল রায়ও বাবার কাছ থেকে বিদ্যাসাগরের এই বাঙালী ভাবটি পেয়েছিলেন। সাজে পোশাকে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী।

বালক প্রফুল্ল যখন কলকাতায় আসেন তখন কলকাতার চেহারা পাল্টাচ্ছে। পলতার ফিল্টার করা কলের জল তখন ঘরে ঘরে পৌঁছে

গেছে। হেয়ার ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয় তাঁকে। স্কুলের বইয়ের চেয়ে বাইরের বই পড়ায় দারুণ আগ্রহ তাঁর। বিশেষ করে বিখ্যাত লোকেদের জীবনকথা পড়তে তাঁর খুব ভাল লাগে। নিউটন, গ্যালিলিও, বেঞ্জামিন, ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনী বার বার পড়েও আশ মেটে না। তবে ইতিহাস পড়তে ভাল লাগে। বুড়ো বয়সেও হেসে বলতেন, "দেখ ইচ্ছা ছিল ঐতিহাসিক হই কিন্তু হলাম রসায়নবিদ্।" অবশ্য হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস লিখে তাঁর সে ইচ্ছা খানিকটা পূরণ হয়েছিল।

হঠাৎ তিনি দারুণ রক্ত আমাশয় রোগে পড়ে গেলেন। সেরে উঠলেন বটে কিন্তু চিরকালের জন্য তাঁর হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। অসুখের জন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ। সারাদিন কাটে বাবার লাইব্রেরীতে। একদিন হল কি 'প্রিন্সিপিয়া ল্যাটিন' বলে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মনে হল ল্যাটিন আর সংস্কৃত ভাষার মধ্যে তো আশ্চর্য মিল। নিজের চেষ্টায় ল্যাটিন শিখলেন। আর অবাক হয়ে দেখলেন ল্যাটিন জানলে ফরাসী ভাষাও শেখা যায়। এই অসাধারণ বুদ্ধিমান বালক ফরাসীও শিখে ফেললেন।

শরীর সারাতে গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থাকলেন খুলনা জেলার রাড়ুলি তাঁদের পৈতৃক গ্রামে। গ্রামের দুঃখী চাষী মজুরদের সঙ্গে ভালভাবে মিশে বুঝলেন এদের উন্নতি না হলে দেশের কোন আশা নেই। দেখতেন এই সব দুঃখী মানুষ অসুস্থ হলে পোকামাকড়ের মত মারা যায়। মা ভুবনমোহিনী দেবীর কাছ থেকে সাগু, এরারুট, মিছরী নিয়ে এদের কুঁড়েঘরে পৌঁছে দিতেন।

বি. এ. পরীক্ষা দেবার আগেই বিলাত চলে যান। সেখান থেকে ডি. এস. সি. উপাধি নিয়ে দেশে ফেরেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে নেন অধ্যাপকের কাজ। এই কলেজেরই গবেষণাগারে 'মার্কিউরাস নাইট্রাইট' আবিষ্কার করে জগদ্বিখ্যাত হন। জগতের সেরা বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম বলে স্বীকৃতি পান।

তিনি ঠিক করেন চিরজীবন অবিবাহিত থেকে দেশের জন্য কাজ করে যাবেন। দেশের প্রতিভাবান ছেলেরা চাকুরী করে জীবন নষ্ট করে দেখে তিনি দুঃখ পেতেন। তাই বিজ্ঞান গবেষণার কাজে তাঁদের এমন-

ভাবে অনুপ্রেরণা দেন যে তাঁরা ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক রূপে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, পঞ্চানন নিয়োগী, রসিকলাল দত্ত ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নাম সকলেই জানেন। দেশের ছেলেরা সামান্য কেরাণীগিরির জন্যে হাহাকার করছে দেখে তিনি ব্যথা পেতেন। তিনি চাইতেন তারা স্বাধীনভাবে কায়িক শ্রমের জোরে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তুলুক।

তাদের প্রেরণা দেবার জন্যই তিনি তৈরী করেন বেঙ্গল কেমিক্যাল দেশী ঔষধের কারখানা। অধ্যাপনা, বিজ্ঞান সাধনা, বেঙ্গল কেমিক্যাল পরিচালনা এতগুলি ক্ষেত্রে কাজ করা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ, বন্যায় দেশের লোক কষ্ট পেলে তিনি ছুটে যেতেন তরুণ যুবকের মত। উত্তরবঙ্গের ভীষণ বন্যার সময় বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক শত শত তরুণ যুবককে নিয়ে ছুটে যান উত্তরবঙ্গে। তাঁর সহকারীদের মধ্যে তরুণ সুভাষচন্দ্রও ছিলেন।

সামান্য পোশাক, সামান্য খাদ্যেই তিনি ছিলেন পরিতুষ্ট। বিজ্ঞান কলেজ থেকে পাওয়া ষাট হাজার টাকা দেশের তরুণদের বিজ্ঞান সাধনার জন্য দান করে দেন। এছাড়া তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য উইল করে দিয়ে যান। একদিকে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, অন্যদিকে সর্বস্বত্যাগী এই মহাপুরুষ যে সারাদেশের প্রণম্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তা বোধ হয় বুঝিয়ে বলতে হবে না।

[প্রেম রসায়নে ওগো সর্বজন প্রিয়,
করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।

—রবীন্দ্রনাথ]

বাঙালী বিশ্বকবি

মেদিনীপুরের হিজলী জেলে তুটি নিরীহ যুবককে গুলি করে মারলো ইংরাজ পুলিস। যুবক তুটির একজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র সন্তোষ মিত্র। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছিলেন তিনি। ইংরাজের গোলামী করতে রাজী ছিলেন না, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে কারাবাস। হিজলী জেলে বন্দী করে রাখা হয় তাঁকে। একদিন গভীর রাতে হঠাৎ তাঁর ঘরে ঢুকে পুলিস তাঁকে গুলি করে যায়। সারা দেশ বেদনায় মূক হয়ে যায়। কিন্তু এমন কেউ ছিল না যে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে।

সেদিন একজন কবি এগিয়ে এলেন ইংরাজের এই হীন কাজের প্রতিবাদে। শহীদ মিনারের নীচে গড়ের মাঠের এক সভায় তিনি বললেন, ইংরাজ শাসকের এই ঘৃণিত কাজের ফলে ইংরাজ রাজত্বের দিন ভারতে শেষ হয়ে এল বলে। দেশের সকলেই এমনকি বক্তা নিজেই ভেবেছিলেন তাঁর এই বক্তৃতার ফলে ইংরাজ সরকার নিশ্চয়ই তাঁকে বন্দী করবে। এবং পাঠিয়ে দেবে মান্দালয় বা আন্দামানে নির্বাসনে। বাড়ীতে পুত্র ও পুত্রবধূর কাছে এই আশংকার কথা জানিয়েও এসে-ছিলেন। সভা আরম্ভ হলে দেখা গেল চারিদিকে লাল পাগড়ীধারী পুলিস। পুলিসের গাড়ীও দাঁড়িয়ে। দীর্ঘদেহ সুন্দর পুরুষটি বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। হাওয়ায় উড়তে লাগলো তাঁর কাশের মত সাদা চুল আর দাড়ি। দারুণ অসুস্থ ছিলেন। তা সত্ত্বেও এতবড় অন্যায়ের প্রতি-বাদ করতে সভায় না এসে পারেননি। কথা বলতে বলতে হাঁফিয়ে পড়েন, তখনই তাঁর নাকের কাছে অক্সিজেনের নলটি বাড়িয়ে ধরেন সেদিনের তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র।

না, পুলিসের গাড়ী ফিরে গেল। এই মানুষটিকে ধরার সাহস তাদের হোল না; কারণ এই মানুষটিতো সাধারণ নন, ইনি একজন মহাকবি। লর্ড কার্জন যখন বাঙলা দেশকে দু-টুকরো করে দেন তখন সেই ভাঙা বাঙলাকে জোড়া দেবার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয় তার চারণ কবি ছিলেন ইনি। হিন্দু-মুসলমান সকলের হাতে মিলনের রাখী তিনি সেদিন পরিয়ে দিয়েছিলেন। পথে পথে গেয়ে বেড়িয়েছিলেন ঃ

বাঙলার মাটি, বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন—এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান।

তারপর একদিন তাঁর সাহিত্য সাধনার পুরস্কার মেলে। সারা এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম পান 'নোবেল' পুরস্কার। চারিদিক থেকে যশ সম্মান তিনি লাভ করেন। দেশ-বিদেশ থেকে আসে আমন্ত্রণ। ইংরাজ সরকারও বেগতিক দেখে 'স্যার' উপাধি না দিয়ে পারে না। কিন্তু এই উপাধি তিনি ব্যবহারই করেননি। শেষ পর্যন্ত এটা ত্যাগই করেছিলেন। সেই কথাটাই তোমাদের বলি।

তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলেছে। জার্মান-ইংরেজের লড়াই। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামী তরুণেরা দেখলেন এই সুযোগ। ইংরেজকে কাবু করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে। ইংরেজরা পেল দারুণ ভয়। তারা একটা আইন পাস করে দেশের ছেলেদের জেলে বন্দী করতে শুরু করল। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের একটা পাঁচিল ঘেরা জায়গায় ইংরেজ পুলিস হঠাৎ গুলি চালিয়ে ৩৭৯ জন লোককে মেরে ফেললে। তার মধ্যে অনেক শিশু, নারী, আর বৃদ্ধও ছিলেন। খবরটা চেপে রাখা হল। কিন্তু এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের খবর বাইরে বেরিয়ে পড়লো। শুনে সবাই থ' হয়ে গেল। কিন্তু টুঁ শব্দটি করতেও সাহস পেল না। সেই কবি এবারও এগিয়ে এলেন। বড়লাটকে চিঠি লিখে জানালেন, ইংরাজ পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি ইংরাজের দেওয়া সম্মান

উপাধি ত্যাগ করলেন। এই নির্ভীক কবির জন্ম কলকাতার এক মহা ধনী পরিবারে। এঁর ঠাকুর্দাকে রানী ভিক্টোরিয়া ডিনারে পাশে বসিয়ে সাদরে আহার করিয়েছিলেন। বিলাতে এত খরচ করতেন লোকে তাঁকে বলতো প্রিন্স। রাজকুমার। এই কবির বাবা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা। নাম দেবেন্দ্রনাথ। ধনীর সন্তান হয়েও তিনি ঋষির মত ঈশ্বর আরাধনায় দিন কাটাতেন। লোকে তাঁকে 'মহর্ষি' বলতো। এঁরই ছোট ছেলে এই কবি। স্কুলে যেতে ভাল লাগতো না। জোড়াসাঁকোর মস্ত বাড়ীর ছাদে ঘুরে বেড়াতেন, পড়তেন নানা বাইরের বই। অল্প বয়সেই লিখে ফেলেন একটি চমৎকার কবিতা।

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলীদলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিঃশব্দ
পিপীলিকা কেঁদে যায় পাতে।

তারপর খাতার পর খাতা ভরিয়ে ফেলেন কবিতা লিখে। ব্যারিস্টার হবার জন্য বিলাত গিয়েছিলেন। কিন্তু তা হওয়া হয়নি। বাবার আদেশে জমিদারী দেখতে গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে। সেখানে থাকতেন পদ্মানদীতে বোটের ওপর। আর লিখতেন চমৎকার ছোট ছোট গল্প। বিচিত্র এই কবির জীবন। বদ্ধ ঘরের মধ্যে মাস্টারের বেত আর চোখ রাঙানিতে যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হয় না তা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বীরভূমের মাঠের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাঁর বিদ্যালয়। গাছের নীচে ঘাসের উপর বসত ছেলেরা আর দেশবিদেশের সেরা পণ্ডিতেরা পড়াতেন তাদের। কবি নিজেও ছেলেদের পড়াতে পছন্দ করতেন। বীরভূমের ভুবনডাঙ্গার মাঠেই কবি গড়ে তোলেন শান্তিনিকেতন। আজ সেখানে গড়ে উঠেছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

এই অসাধারণ মানুষটি শুধু কবিই নন তিনি সুরকার, গীতিকারও বটে। প্রায় আড়াই হাজার গান লিখেছেন তিনি। এত গান পৃথিবীর আর কোন কবি রচনা করতে পারেননি। দুটি স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীত এঁর রচনা। 'জনগণমন-অধিনায়ক' ভারতের আর 'ও আমার সোনার বাঙলা' স্বাধীন বাঙলা দেশের জাতীয় সঙ্গীত। ইনি ঔপন্যাসিক, নাট্যকারও বটে। জীবনের শেষদিকে ছবি আঁকা শুরু করেন। সে ছবি দেখে ইউরোপ, আমেরিকার মানুষ অবাক হয়ে যায়।

এমন প্রতিভাবান মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে কমই এসেছেন। শুধু কি প্রতিভা, তাঁর রূপও তুলনাহীন। একবার জার্মানীর এক গ্রামে ভোরবেলা বেড়াচ্ছেন—এক বৃদ্ধা মহিলা তাঁকে যীশু যীশু বলে চীৎকার করে ওঠেন। লোক জড়ো হয়ে যায়। এই পরম রূপবান মানুষটিকে রক্তমাংসের জীব বলে তারা বিশ্বাসই করতে চায় না। শেষে গ্রামের গীর্জায় নিয়ে গিয়ে তাঁর উপদেশ ও আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়।

এই আশ্চর্য মহামানবকে তা বোধ করি তোমাদের বলে দেবার দরকার নেই। ইনি ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান বাঙালী রবীন্দ্রনাথ।

[ধন্য কবি! কাব্যলোকের ছত্রপতি! ধন্য তুমি
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি।
বঙ্গভূমি ধন্য হল তোমায় ধরি অঙ্কে কবি।
ধন্য ভারত, ধন্য জগৎ, ভাব জগতের নিত্য-রবি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

দরদী কথাশিল্পী

কলকাতার চাঁদপাল ঘাট থেকে জাহাজ ছাড়ছে, ভোঁ দিচ্ছে যাবে রেঙ্গুন। রোগা ফর্সা মত মাথায় একরাশ এলোমেলো চুল ছাব্বিশ সাতাশ বছরের একটি যুবক ডেকের উপর দাঁড়িয়ে ডাঙার দিকে চেয়ে আছে। চোখে জল। চাকরীর খোঁজে সে চলেছে ব্রহ্মদেশে। সহায় সম্বল বলতে কিছু নেই। মা-বাপ অনেকদিন মারা গেছেন। ছোট ছোট ভাইবোনেদের কাউকে ভাগলপুরে, কাউকে জলপাইগুড়িতে আত্মীয়স্বজনের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে চলেছেন দূর দেশে। তারপর ক' বছর কেটে গেল, হতভাগ্য এই মানুষটির কথা লোকে ভুলেই গেল। এমনি সময় 'ভারতী' বলে কলকাতার এক কাগজে বড়দিদি ,নামে একটা বড় গল্প বেরুলো। পড়ে সবাই এমন কি রবীন্দ্রনাথও অবাক হয়ে গেলেন। তারপর আরও বছর পাঁচ ছয় কাটলো। 'যমুনা' বলে একটা ছোট্ট কাগজে সেই লেখকেরই 'রামের সুমতি' বলে একটা গল্প বেরুলো। এত সরস ভাষা আগে কারও লেখায় দেখা যায়নি। লেখকের নাম শরৎচন্দ্র। তারপর 'যমুনা'তেই প্রকাশিত হল আরও দুটি গল্প 'বিন্দুর ছেলে' আর 'পথনির্দেশ'। 'পথনির্দেশ' পড়ে বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসুও মুগ্ধ হলেন। রেঙ্গুনযাত্রী সেই যুবকই শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের কলকাতার বন্ধুরা ঠিক করলেন তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু তিনি আসেন কি করে। ওখানে তিনি যে চাকরী করেন। মাইনে পান শ' খানেক টাকা। ছেলেবেলা থেকেই খুব দুঃখ-কষ্টে তাঁর দিন কেটেছে। পৈতৃক গ্রাম তাঁর হুগলীর দেবানন্দপুরে। ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত ছিলেন তিনি। মাছ ধরতে, গাছে চড়তে, নৌকা বাইতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। প্রায়ই পাঠশালা পালাতেন। আর লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন যত রাজ্যের অপাঠ্য বই। তাঁর বাবা ছিলেন ভারি খেয়ালী। কোন চাকরীই বেশীদিন করতে পারতেন না। কিন্তু প্রতিভা ছিল তাঁর। গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখতে পারতেন। কিন্তু কোনটাই শেষ করতেন না। বালক শরৎচন্দ্র

সেই লেখাগুলো সামনে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন। ভাবতেন এর শেষ কি হতে পারে। এমনি করেই তাঁর গল্প লেখা শুরু।

বাপের চাকরী না থাকায় শরৎচন্দ্রকে মামার বাড়ী ভাগলপুরে আশ্রয় নিতে হয়। শোনা যায় মাত্র কুড়িটি টাকা যোগাড় করতে না পারায় তাঁর এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। তারপর নানা ঘাটের জল খেয়ে নানা দুঃখকষ্ট সয়ে শেষে চাকরীর সন্ধানে যান রেঙ্গুন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ফিরিয়ে আনেন কলকাতায়। তিনি যোগ দেন সেকালের বিখ্যাত মাসিক পত্র 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। এই পত্রিকাতেই একে একে প্রকাশিত হয় 'বিরাজ বৌ', 'পল্লীসমাজ', 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি। খ্যাতি, যশ, অর্থ সবই লাভ করেন শরৎচন্দ্র।

বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'পল্লীসমাজ' বইটি দু'এক পাতা রোজ পড়তেন ঘুমোবার আগে। নিজে দুঃখ পেয়েছিলেন তাই দুঃখী মানুষদের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদত। যখনই কলকাতার বাড়ী থেকে সামতাবেড়ের বাড়ীতে যেতেন তখন এক রাশ ছোট বড় ধুতি শাড়ী সঙ্গে নিতেন। আর খুচরো সিকি, আধুলি নিতেন বেশ কয়েক শ টাকার। সেই দুঃখী মানুষদের হাতে কাপড় আর পয়সা দিয়ে বড় আনন্দ পেতেন।

শুধু মানুষ নয়—পশু পাখীর ওপর তাঁর ভালবাসা ছিল অগাধ। রেঙ্গুনে থাকতে একটা পোষা টিয়া পাখী মারা যেতে তিনি তিন দিন অফিস কামাই করেছিলেন। তাঁর প্রিয় কুকুরের নাম ছিল 'ভেলু'। কুকুরটা যাকে বলে একেবারে দেশী, নেড়ী কুত্তা। তার ভয়ে লোকে শরৎচন্দ্রের বাড়ী ঢুকতেই পারত না। কতবার কতজনকে যে কামড়েছে তার ঠিক নেই। কুকুরটা যখন মারা যায় শরৎচন্দ্র ছোট ছেলের মত কেঁদেছিলেন। দেশের দুঃখী মানুষদের তিনি ছিলেন আপনজন। তিনি মনে করতেন দেশ স্বাধীন না হলে দেশ চিরকালই গরীব থেকে যাবে। তাই যেসব তরুণ বিপ্লবী ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করার চেষ্টা করতেন তাদের তিনি শুধু ভালবাসতেন না, শ্রদ্ধাও করতেন। এই বিপ্লবীদের জীবন নিয়েই লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত বই 'পথের দাবী'। বইটি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার বইটিকে বাজেয়াপ্ত করে দেয়। কিন্তু তিন টাকার বইটি গোপনে গোপনে দশ টাকাতেও বিক্রী হয়ে যায়। সকলে ভেবেছিলেন, এবার লেখককে ধরে ইংরেজ জেলে

বন্দী করবে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের দেশব্যাপী জনপ্রিয়তার কথা ভেবে ইংরাজ পুলিশ সে সাহস করেনি।

চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবী সূর্য সেন ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আর আশ্চর্যের বিষয় হাওড়ার সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাড়ী পুলিশে ঘিরে ফেলে। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব নিজেই আসেন তাঁর বাড়ী সার্চ করতে। কিন্তু এবারও পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে না। অথচ পুলিশ জেনেছিল শরৎচন্দ্র গোপনে সূর্য সেনকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। শুধু তাই নয় তাঁর মাতুল বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলী নানা ছদ্মবেশে তাঁর কাছে এসে টাকা নিয়ে যেতেন। সে টাকা লাগতো অস্ত্র কেনার কাজে। এসব কথা জানা থাকলেও ইংরাজ পুলিশ শরৎচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করতে ভয় পেয়েছিল। কারণ শরৎচন্দ্রের বই তখন নানা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। শুধু এদেশের নয় বিদেশী ভাষাতেও। ফরাসী মনীষী রেঁামা রেঁালা তাঁর 'শ্রীকান্ত' পড়ে বলেছিলেন এ বই নোবেল পুরস্কার পেতে পারে। তাঁর গায়ে হাত দিলে দেশবাসী তা কখনই ক্ষমা করতো না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছিল ডি. লিট. উপাধি। সবচেয়ে বড় কথা হাজার হাজার পাঠক তাঁর বই পড়ে তাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করতেন। আজও তাঁর বই লোকে আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করে থাকেন।

তোমাদের বোধ হয় বলে দিতে হবে না এই শরৎচন্দ্র আর কেউ নন দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির হতে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।

—রবীন্দ্রনাথ]

বাংলার বাঘ

ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় চলেছেন কলকাতার এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মোটাসোটা চেহারা, কাঁচা পাকা মস্ত গোঁফ, দেখলেই বেশ সম্ভ্রম জাগে। সে কামরায় আরও একটি লোক চলেছে, লোকটি সাদা চামড়ার সাহেব। কামরায় এক কালা আদমী থাকায় সাহেবটি মহাবিরক্ত। তখন ভারতবর্ষ পরাধীন। সাহেবদের প্রতাপ খুব। কথায় কথায় লোককে 'ড্যাম', 'নিগার' বলে গালাগালি করে আর লাথি মেরে গরীব লোকের পিলে ফাটায়। কারও সাধ্য ছিল না এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।

প্রৌঢ় লোকটি হাত মুখ ধুতে বাথরুমে গেছেন। দুষ্ট সাহেবটি করল কি, ভদ্রলোকের জুতো জোড়া জানলা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল। ভদ্রলোক বাথরুম থেকে ফিরে তো অবাক! জুতো জোড়া গেল কোথায়, সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোন উচ্চবাচ্যই করল না। ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন, এটা সাহেবেরই নষ্টামি। কিছু বললেন না। গম্ভীরভাবে বসে একটা বই পড়তে লাগলেন, ঘণ্টাখানেক বাদে সাহেব গেল বাথরুমে। ভদ্রলোকটি সাহেবের দামী কোটটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। ট্রেন ছুটে চলেছে। সাহেব বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে, বোধ হয় পরের স্টেশনেই নামবে। কোট গায়ে দিতে গিয়ে, তার চক্ষুতো ছানা বড়া। কোট গেল কোথায়! দারুণ রেগে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলো, 'এই বাবু, আমার কোট কোথায় গেল?' বাবুটি শান্তভাবে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে জানালেন, 'তোমার কোট আমার জুতোকে খুঁজতে গেছে।' অসম সাহসী এই ভদ্রলোকটি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সাহস ও বিক্রমের জন্য তাঁকে "বাঙলার বাঘ" বলা হ'ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটি উচ্চ উপাধি তিনি পেয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচবার উপাচার্য হয়েছিলেন। এমনটি আর কেউ হতে পারেন নি। আশুতোষের বাবা গঙ্গাপ্রসাদ চেয়েছিলেন ছেলে যথার্থ মানুষ হোক। তাই খুব ভোরে ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে ভবানীপুরের

বাড়ী থেকে বেড়াতে বেরুতেন। গল্পের ছলে শোনাতেন জ্ঞানীগুণী মানুষদের জীবনী,—দেশ-বিদেশের ইতিহাস আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা। ছাত্রজীবনে পাওয়া সোনার মেডেল দেখিয়ে বলতেন, "দেখ, যদি ভাল করে লেখাপড়া কর তবে তুমিও এমনি সোনার মেডেল পাবে।"

গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ী বেড়াতে আসতেন হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ মিত্র। বালক মনে জেগে ওঠে আকাঙ্ক্ষা,—তিনি জজ হবেন। কিন্তু ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন ভারি লাজুক আর মুখচোরা। বাবা গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "জজ হতে হলে আগে উকিল হতে হবে,—উকিলদের তো লাজুক মুখচোরা হলে চলবে না।" তাই ছেলেকে একটা টুলের উপর দাঁড় করিয়ে বলতেন, "স্কুলের পড়া বেশ চেঁচিয়ে পড়,—মনে করবে যে তুমি বক্তৃতা করছ।"

আশুতোষ তখন সাউথ সুবার্বন স্কুলের ছাত্র। অঙ্কটা তাঁর ভারি ভাল লাগতো। এমনি সময় শুনলেন ফরাসী ভাষা না জানলে ভাল রকম অঙ্ক শেখা যাবে না। তাই বাড়ী বসেই শুধু ফরাসী নয়, ল্যাটিন ভাষা পর্যন্ত শিখে ফেললেন। এই সময় ভারি একটা মজার ব্যাপার ঘটলো। বিলাতের একটা পত্রিকা-সম্পাদক ভারতবর্ষ থেকে একটি প্রবন্ধ পেলেন, তাতে ইউক্লিডের ২৫ নম্বরের উপপাদ্যটিকে নতুন পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রকাশ করে সম্পাদক মহাশয় ভারতবর্ষীয় লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানালেন। তাঁর ধারণা ছিল লেখক প্রবীণ বয়স্ক। কিন্তু যখন জানা গেল লেখকের বয়স মাত্র ষোল, সবাই অবাক হয়ে গেলেন।

পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করার জন্য আশুতোষ রাত জেগে পড়তেন। কিন্তু বাবা গঙ্গাপ্রসাদের নির্দেশ ছিল রাত দশটার মধ্যে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়তে হবে। গঙ্গাপ্রসাদ রোজ খোঁজ নিতেন ছেলে শুয়ে পড়েছেন কিনা। এদিকে আশুতোষ বাবার চটির শব্দ দূরে মিলিয়ে গেলে প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসতেন। এর ফল ভাল হয়নি। নিদারুণ মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়। নানা চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায়, গাজীপুরে হাওয়া বদলাতে যান। সেখানে একটি ইঁদারার পাড়ে বসে স্নান করছেন, এমনি সময় একটি দুষ্টু ছেলে, ইঁদারার পাশের একটি গাছে, ভীমরুলের চাকে ইঁট মারে। ভীমরুলের দল রেগে বেরিয়ে এসে আশুতোষকে কামড়ায়। যন্ত্রণায় আশুতোষ অজ্ঞান হয়ে যায়। পুরো ২৪ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকার

পর যখন তাঁর জ্ঞান হল, দেখা গেল তাঁর মাথার অসুখ একেবারে সেরে গেছে। কলকাতা ফিরে আবার পড়াশোনা শুরু করলেন। দুর্বল শরীরে খাটুনি সহ্য হল না। এবার হল টাইফয়েড রোগ। সেরে উঠলেন। হিতৈষীরা বললেন, "এফ. এ. পরীক্ষা দিয়ে কাজ নেই।" কিন্তু তেজী আশুতোষ পরীক্ষা দিলেন,—সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন, ফল বেরুল,— আশুতোষ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। তবে মনটা তাঁর ভারি খারাপ হয়ে গেল, কারণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি হয়েছিলেন দ্বিতীয়। তিনি বুঝলেন সুস্বাস্থ্য ছাড়া জীবনে উন্নতি লাভ অসম্ভব। তাই ব্যায়াম করা শুরু করলেন, মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন। শরীরের যেমন উন্নতি হল তেমনি এরপর আর কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় হননি। ছেলে-বেলার আকাঙ্ক্ষা তাঁর পূর্ণ হয়েছিল। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। আশুতোষ ছিলেন বড় মাতৃভক্ত। মায়ের আদেশই ছিল তাঁর শেষ কথা। একবার বড়লাট কার্জন সাহেব তাঁকে বিলাত যাবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু আশুতোষের মা তাঁকে বিলাত যেতে নিষেধ করেন। শুনে লর্ড কার্জন তো অবাক। আশুতোষকে বললেন, 'আপনি মাকে বলুন স্বয়ং লাটসাহেব তাঁর ছেলেকে বিলাত যেতে আদেশ করেছেন।' আশুতোষ বলেছিলেন, 'মায়ের আদেশই আমার কাছে সবচেয়ে বড়। আর কারও আদেশ বা অনুরোধ আমার কাছে তুচ্ছ।'

আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাঙলার কোন মর্যাদা ছিল না। আশুতোষের চেষ্টায় প্রবেশিকা থেকে এম. এ. পর্যন্ত বাঙলা ভাষা আবশ্যিক ভাষা রূপে গণ্য হয়। এর জন্য তাঁকে কম লড়াই করতে হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন বাঙলার ঘরে ঘরে অন্ততঃ একজন করে গ্রাজুয়েট থাকবে। তাঁর স্বপ্ন আজ সফল।

[জন শিক্ষার ভিত্তি পাষাণে সৌধ তুলেছ চূড়ায় যার,
সূর্যকান্ত মনির দীপালি হরে ভারতের অন্ধকার।
শ্বেতাম্বরার রত্নবেদীতে প্রতীচ্য জ্ঞান-তপস্বীর,
পূজার অর্ঘ্য পুঞ্জিত করি সার্থক তুমি কর্মবীর।
—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়]

বহু ভাষাবিদ্ বাঙালী

বিখ্যাত এক রুশ পণ্ডিত ভারতে এসেছেন। রুশ ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক তরুণ যুবাকে ডেকে পাঠালেন। সেই যুবক অক্লেশে রুশ পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলে সবাইকে অবাক করে দিলেন। কিছু-দিন পরেই জাপান থেকে এলেন এক জাপানী পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে এই যুবক কথা বললেন, জাপানী ভাষায়।

হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট কুক সাহেব তো চমকে উঠেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" গানের ল্যাটিন অনুবাদ পড়ে। 'কুক' সাহেব ছিলেন অক্সফোর্ডের ছাত্র। ল্যাটিন ভাষায় স্কলার। তিনি তো বিশ্বাসই করতে চাইলেন না, এই অনুবাদ করেছে একজন বাঙালীর ছেলে। এই ছেলেটি আবার বর্ধমানের মহারাজার দোভাষী হয়ে, ইউরোপ গিয়ে পোপের সঙ্গে ল্যাটিন ভাষায় কথা বলে' পোপকে একেবারে হতবাক করে দিয়েছিলেন।

এই নানা ভাষা জানা যুবকটির নাম হরিনাথ দে। মাত্র চৌত্রিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। শিখেছিলেন ছত্রিশটি ভাষা। ভাষার জাদুকর বলা হয় তাঁকে। এই বয়সেই তিনি দেশ-বিদেশে যশ ও খ্যাতি পেয়ে-ছিলেন। কিন্তু পুরোপুরি ভাবে প্রতিভা বিকাশের আগেই এঁর মহা-মূল্যবান জীবনের অবসান ঘটে। সাধারণ লোকে এঁর নামটি মাত্র শুনেছেন। তাঁর বাল্যজীবনের কথা খুব সামান্যই জানা যায়।

মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে হরিনাথের বাবা ভূতনাথ দে ওকালতি করতেন। ভূতনাথ দে'র পৈতৃক নিবাস ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহড়ু গ্রামে। তিনি বিবাহ করেছিলেন, উত্তর ২৪ পরগনার আড়িয়াদহে। ওখানেই ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে ১২ই অগস্ট হরিনাথের জন্ম। তাঁর মা এলোকেশী দেবী ছিলেন সেকালের তুলনায় বেশ শিক্ষিতা। ইংরেজী ছাড়া হিন্দী, মারাঠীও জানতেন। হরিনাথের ইংরেজী বর্ণপরিচয় হয়েছিল মার কাছে।

মা, সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে শিশু হরিনাথকে এ. বি. সি. ডি. লিখতে শেখান। তারপর অবাক হয়ে দেখেন, সারা বাড়ীর দেওয়াল আর মেঝেতে, হরিনাথ কাঠ-কয়লা দিয়ে এ, বি, সি, ডি লিখে রেখেছেন। রায়পুরের নর্মাল স্কুলে হরিনাথের পড়াশুনা শুরু হয়। স্কুলের বাঁধা-ধরা পড়াশুনা তাঁর ভাল লাগতো না। তিনি অঙ্কে ছিলেন একটু কাঁচা, তাই অঙ্কের ভয়ে স্কুল পালাতেন।

একবার হল কি, ক্লাসের সেরা ছাত্র নাটুর বাড়ীতে গিয়ে, তার সঙ্গে খেলা করছেন। নাটুর বাবা দারুণ রেগে বকাবকি করে, হরিনাথকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। এ অপমানটা হরিনাথের বুকে বড় বাজলো। প্রতিজ্ঞা করলেন, এবার থেকে পরীক্ষায় প্রথম হতে হবে। সে প্রতিজ্ঞা তিনি রেখেছিলেন।

রায়পুরের মিড্‌ল স্কুলের পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে, কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। এখান থেকে প্রথম বিভাগে, তিনি শুধু পাসই করলেন না, বৃত্তিও পেলেন। এফ. এ. পরীক্ষায় ল্যাটিন ও ইংরেজীতে প্রথম হয়ে পেলেন, 'ডাফ স্কলারশিপ'। বি. এ. পরীক্ষায় ল্যাটিন ও ইংরেজী অনার্সে প্রথম হয়ে পেলেন সোনার মেডেল। তারপর একে একে ল্যাটিন, গ্রীক, পালি, সংস্কৃত প্রভৃতি আরো ছটি বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এক অসাধারণ কৃতিত্বের নজির সৃষ্টি করলেন।

এরপর সরকারী বৃত্তি পেয়ে, হরিনাথ গেলেন বিলাত। ওখানকার কেমব্রিজের ট্রাইপস পরীক্ষায় সফল হন। ল্যাটিন, গ্রীকে কবিতা লিখে পুরস্কার পান। ভাষা শিক্ষার জন্য ইউরোপ ভ্রমণ করেন। প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার পর মিশরে যান। সেখানে আরবী শেখেন। ইণ্ডিয়ান এডুকেশানাল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে, তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ইংল্যাণ্ডে নিযুক্ত তিনিই প্রথম আই. ই. এস.। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে চলে তাঁর ভাষাশিক্ষা। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে, তাঁর ছিল এক সহজাত প্রতিভা। ইংরেজী ছাড়া গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর যেমন দক্ষতা ছিল, তেমনি সংস্কৃত, পালি, আরবী, ফার্সি, উর্দু, হিন্দী, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী ও বাঙলা ভাষাতেও তাঁর দখল ছিল অসাধারণ।

এ ছাড়া পর্তুগীজ, ডাচ, রুশ, ডেনিশ, রুমানীয়ান ভাষা বেশ ভালভাবেই জানতেন। দুরূহ হিব্রু, চীনা, তিব্বতী, তুর্কী ভাষাও শিক্ষা করেছিলেন তিনি। মোট ছত্রিশটি ভাষা তিনি শিখেছিলেন। তাঁর এই ভাষা দক্ষতার জন্য তাঁকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান পদ দেওয়া হয়। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়।

হরিনাথ দে শুধুমাত্র বিদ্যার জাহাজই ছিলেন না, তিনি ছিলেন দয়ালু, পরদুঃখকাতর মানুষ। বহু দরিদ্র মানুষকে তিনি অকাতরে অর্থ দান করতেন। ঋণ করেও লোককে সাহায্য করতে কাতর হতেন না। এ বিষয়ে তাঁর আদর্শ ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। দেশের দুর্ভাগ্য, অকালে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে এই অসাধারণ প্রতিভা, দুরন্ত টাইফয়েড্ রোগে নির্বাপিত হয়ে যায়। উত্তর কলিকাতায় তাঁর নামে একটি রাস্তা আছে।

[আজ শ্মশানে বহ্নিশিখা অভ্রভেদী তীব্র জ্বালা,—
আজ শ্মশানে পড়ছে ঝরে উল্কাতরল জ্বালার মালা।
যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব—শ্মশান শুধু হচ্ছে আলা,
যাচ্ছে পুড়ে নূতন করে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।

আজ শ্মশানে বঙ্গভূমির নিব্‌ল উজল একটি তারা
রইল শুধু নামের স্মৃতি বইল কেবল অশ্রুধারা,
নিবে গেল অমূল্যপ্রাণ, নিবে গেল বহ্নিশিখা
বঙ্গভূমির ললাট' পরে রইল আঁকা ভস্মটীকা।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

দেশবন্ধু

এক গরীব ব্রাহ্মণ এসেছেন কালীঘাটের কাছে রসা রোডে এক ব্যারিস্টারের বাড়ী। শুনেছেন ব্যারিস্টারটি ভারি দাতা। ব্রাহ্মণের কন্যা দায়। মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন কিন্তু টাকা যোগাড় করে উঠতে পারেননি। তাই অনেক কষ্টে ঠিকানা যোগাড় করে গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছেন। ব্রাহ্মণটি যখন ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়ীর সামনে পৌঁছেছেন। দেখেন সাহেব বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। সামনে গাড়ী দাঁড়িয়ে। কোর্টে বেরুবেন। ব্রাহ্মণটি হাত জোড় করে সাহেবের সামনে উপস্থিত হলে সাহেব হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাই ?" ব্রাহ্মণ জানালেন তাঁর দায়। সাহেব বললেন, "হাতে একেবারে কিচ্ছু নেই, আপনি এক কাজ করুন, আপনি কালীঘাটের গঙ্গায় স্নান করে আসুন। এখানেই আহারাদি করুন, ভয় নেই জাত যাবে না। রান্নার আলাদা ব্যবস্থা আছে, খাঁটী উড়িয়া রাঁধুনী বামুনে রান্না করে। বিকেলে ফিরে এসে আপনাকে সাহায্য করবো। আজকের যা রোজগার সব আপনার।" ব্যারিস্টার সাহেব আসলে সাহেব নন, খাঁটী বাঙালী, কলকাতাতেই তাঁর জন্ম। অবশ্য বিলাত যেতে হয়েছিল ব্যারিস্টার হ'তে। কিন্তু হ্যাট, কোট, প্যান্ট পরা নকল সাহেব হয়ে ফেরেননি। দেশে ফিরে প্রথমেই ভাল রোজগার হত না। ট্রামেই কোর্টে যাতায়াত করতেন। কোন কোন দিন বা পয়সার অভাবে হেঁটেই ফিরতেন। বাড়ী ফিরেই কোট, প্যান্টগুলো ছেড়ে ফেলতেন; তারপর বসতেন বাঙ্‌লা কবিতা লিখতে। কবি হিসাবে তাঁর বেশ নামও হয়েছিল। পরপর কখানি কবিতার বইও প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে 'সাগর সঙ্গীত' বলে কাব্যগ্রন্থটি বিখ্যাত।

দেশকে তিনি ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসতেন। তাই বিলাতে এমন এক দেশপ্রেমমূলক বক্তৃতা করেছিলেন যে ইংরেজরা তাঁকে আই. সি. এস. হ'তে দেয়নি। তাই ব্যারিস্টার হয়ে তিনি ফিরেছিলেন। এদেশে ফিরে শ্রীঅরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতার বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন।

অরবিন্দকে কারারুদ্ধ করে ইংরাজ সরকার। অনেকে ভেবেছিলেন তাঁর হয়তো ফাঁসী বা নির্বাসন হবে। কিন্তু আইনের জাল বিস্তার করে অগাধ মনীষা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়ে অরবিন্দকে মুক্ত করেন এই ব্যারিস্টার সাহেব। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। ধনী মক্কেলরা আসতে থাকে। সাহেব প্রতিদিন প্রচুর উপার্জন করতে থাকেন। তাঁর দৈনিক আয় ছিল হাজার দুয়েক টাকা। সেদিনও সাহেব হাইকোর্ট থেকে ফিরলেন সন্ধ্যাবেলায়।' ব্রাহ্মণ উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন বাড়ীর সামনে বারান্দায়। গাড়ী থেকে নেমেই পকেটে হাত দিয়ে নোটের গোছা বার করে ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—"এই নিন। আমার আজকের রোজগার।" ব্রাহ্মণ তো হতভম্ব। ভাবলেন ইনি মানুষ না দেবতা।
সত্য কথাই, গরীব দুঃখী মানুষ তাঁকে দেবতাই ভাবতো। একবার হাত পেতে দাঁড়ালেই হল। পাঁচ টাকা চাইলে দশ টাকা দিয়ে দেন।

ভোগ-বিলাসের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন, এমনি সময় গান্ধীজী এলেন আফ্রিকা থেকে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন পথে মোড় নিল। গান্ধীজী বললেন—"ইংরেজ, তোমরা বিদেশী, তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই। এদেশকে শোষণ করবার অধিকার তোমাদের নেই।" তাঁর ডাকে ইংরেজের ইস্কুল কলেজ অফিস আদালত থেকে সব লোক বেরিয়ে এল। ইংরেজের সঙ্গে তাদের অসহযোগ। এই ব্যারিস্টার সাহেবও গান্ধীজীর অনুরোধে আইন ব্যবসা ত্যাগ করলেন। তখন তাঁর মাসিক আয় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা। দেশের মানুষ অবাক হয়ে গেল তাঁর ত্যাগ দেখে। এদিকে দেশের মানুষের দুঃখে কষ্টে তাঁর দান বন্ধ হোল না। লোকে আদর করে শ্রদ্ধাভরে তাঁকে উপাধি দিল 'দেশবন্ধু' বলে।

দেশবন্ধু যোগ দিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। ছেড়েছিলেন এত দিনের সব আয়েস, আরাম। কোট-প্যাণ্ট আগুনে পোড়ালেন। মিহি শান্তিপুরের ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবী বিলিয়ে দিলেন। এবার পরণে তাঁর খদ্দরের মোটা কাপড়। ইংরেজ দেখলো এমন মানুষ আন্দোলন পরিচালনা করলে তাদের দারুণ বিপদ। কারণ দেশের সেরা ছেলেরা তাঁর একান্ত বাধ্য। কাজেই কারাগারে তাঁকে বন্দী করা হল। কিন্তু কি আশ্চর্য তাঁর দুটি সেবকও সেখানে হাজির।
কারাগারের সাহেব জেলার দেশবন্ধুকে বললেন—"আপনাকে নিয়ে আর

পারা গেল না। আশ্চর্য লোক মশাই আপনি। আপনার একজন সেবক আই. সি. এস. আর একজন পি. আর. এস.। এই আই. সি. এস. সেবক আর কেউ নয় সুভাষচন্দ্র বসু। আর প্রেমচাঁদ রাইচাঁদ বৃত্তি পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেমন্ত সরকার।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে শুনলেন আসামের চা বাগানের কুলীদের উপর ভয়ানক অত্যাচার। অনেকে মারাও গেছে। তারা চাঁদপুরে এসেছিল জাহাজে উঠে পালাবে বলে। সেখানে ইংরাজ পুলিশ সৈন্যরা তাদের মারধর করছে। শুনে দেশবন্ধু আর স্থির থাকতে পারলেন না। স্ত্রী বাসন্তীদেবীকে নিয়ে চাঁদপুরে রওনা হলেন। গোয়ালন্দ পর্যন্ত ট্রেনে এসে দেশবন্ধু দেখলেন চাঁদপুরে যাবার উপায় নেই। জাহাজের কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছে। এখন বর্ষাকাল। ঝড়জলের সময়। পদ্মা নদী ফেঁপে ফুলে উঠেছে। তিনি ঠিক করলেন নৌকাতেই পার হবেন। কিন্তু কোন মাঝি রাজি হল না। তখন দেশবন্ধু বললেন, "ভাই আমি দেশের কাজে চলেছি, তোমরা আমায় সাহায্য করবে না?" শুনে এক সাহসী মাঝি এগিয়ে এল।

প্রায় তিনদিন। দারুণ ঝড়জলের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে দেশবন্ধু ও বাসন্তীদেবী চাঁদপুর এলেন। সেদিন সেখানে যে অভ্যর্থনা পেলেন তার তুলনা নেই। ইংরেজ ভয় পেল। ধর্মঘট মিটে গেল। কুলীরা দেখলো তাদেরও সহায় আছে। আপনজন আছে।

দেশের কাজে সব দিলেন দেশবন্ধু। নিজের বাড়ীটাও দান করে দিলেন দেশের কাজে। সেই বাড়ীতেই গড়ে উঠেছে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন। এখন সেখানে ক্যান্সার রোগের গবেষণাকেন্দ্র।

দারুণ পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গিয়েছিলেন দার্জিলিং। সেখানেই এই মহাপ্রাণের শেষ নিঃশ্বাস বাতাসে মিশে যায়। তাঁর দেহ নিয়ে আসা হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছিল তাঁদের প্রিয় মানুষকে দেখতে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ দানবীর নবযুগের হরিশ্চন্দ্রকে দেখতে। তোমাদের কি বলে দিতে হবে এই সর্বস্ব ত্যাগী দানবীর কে? ইনি ভারতের মুক্তিসংগ্রামের শ্রেষ্ঠ সৈনিক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

[এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥ —রবীন্দ্রনাথ]

এ যুগের শিবাজী

ট্রেন চলেছে পেশোয়ারের দিকে। প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা। তাতে যাত্রী একজন মৌলবী। নাম জিয়াউদ্দিন। মাথায় ফেজ টুপি, মুখে দাড়ি, চোখে চশমা। পেশোয়ারের ট্রেন থেকে নেমে মৌলবী সাহেব পোশাক বদল করে পাঠান উপজাতির পোশাক পরলেন। তিনি বোবা ও কালা। চলেছেন রোগ সারাতে। কৌশলে ভারত সীমান্ত পার হয়ে পৌঁছলেন কাবুল। সেখান থেকে উড়োজাহাজে ইটালীয়ান সাহেবের ছদ্মবেশে পৌঁছলেন রোম। সেখান থেকে বার্লিন।
সেই সাহেবটিকেই দেখা গেল ডুবো জাহাজে আটলান্টিক আর ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে চলেছেন জাপানে।

সেই সাহেবটিকেই দেখা গেল আবার নতুনরূপে। রীতিমত সেনাপতির পোশাকে সৈন্যদল পরিচালনা করছেন। তাঁর সেনাদলের নাম 'আজাদ হিন্দ ফৌজ।' ভারত সীমান্তে উপস্থিত হয়ে উড়িয়ে দিলেন স্বাধীনতার তেরাঙ্গা পতাকা।
এই সাহেবটি কিন্তু আসলে একজন খাঁটী বাঙালীর ছেলে। ছেলেবয়েস থেকেই দেশের পরাধীনতার কথা ভেবে বেদনা পেতেন। যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে ফাঁসী বরণ করেছেন তাঁদের প্রতি এঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। কটকের র‍্যাভেন'শ স্কুলে যখন পড়েন তখন এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। দিনটা ছিল ১১ই অগস্ট। তিন বছর আগে এই দিনে শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়। ছেলেটি সহপাঠীদের বললেন,—"আমরা আজ উপবাস করে স্মরণ করবো সেই মহাবিপ্লবীকে যিনি স্বাধীনতার জন্য ফাঁসীতে জীবন দিয়েছেন।" তখন সারা ভারতে ইংরাজের প্রবল প্রতাপ। বিদেশী শাসককে ভয় না করে এই তরুণ কিশোর, ক্ষুদিরামকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেন। এই কিশোর সুভাষচন্দ্র বসু।
সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথ বসু ২৪ পরগনার কোদালিয়া গ্রাম থেকে গিয়েছিলেন উড়িষ্যার কটক। সুভাষচন্দ্রের জন্ম ওখানেই। ভর্তি হয়েছিলেন সাহেবদের ইংরাজী স্কুলে। এখানে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান

শিক্ষকরা ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন না। কথায় কথায় বেত চালাতেন। পড়ানো হ'ত ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস আর ভূগোল। বাংলা ভাষা শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এমনি সময় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা ভাষাকে করলেন অবশ্যপাঠ্য। কাজেই সুভাষচন্দ্র এসে ভর্তি হলেন র‍্যাভেন'শ কলেজিয়েট স্কুলে। এখানে বাঙলা পড়ানো হয়। তরুণ সুভাষচন্দ্র বিদেশী পোশাক, কোট-প্যাণ্ট ছেড়ে, ধুতি পাঞ্জাবী পরে স্কুলে গেলেন। স্কুলে কিন্তু ভারি মুশকিলে পড়লেন। শিক্ষক মশাই দিলেন 'গরু' সম্পর্কে একটা রচনা লিখতে। বাংলা ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকায় সুভাষচন্দ্রের রচনাটি হল বিচিত্র। শিক্ষক মশাই চেঁচিয়ে পড়েন আর ক্লাশের ছেলেরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। লজ্জা আর অপমানে সুভাষচন্দ্রের ফর্সা মুখ হয়ে ওঠে রাঙা।

সংস্কৃত ক্লাশে অবস্থা হ'ল আরো শোচনীয়। পণ্ডিত বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ জিজ্ঞাসা করলেন, সংস্কৃত কতদূর জানো? সরল সুভাষচন্দ্র বললেন, "অক্ষর পরিচয়ও হয়নি।"

ক্রোধে ফেটে পড়লেন বৃদ্ধ পণ্ডিত,—"তোমার কিচ্ছু হবে না।" কিন্তু বছরের শেষে পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল সুভাষচন্দ্র সব বিষয়ে প্রথম হয়েছেন। সংস্কৃতে পেয়েছেন একশোর মধ্যে একশ। প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাশ, পণ্ডিত মশাইকে বললেন,—"একি ব্যাপার পণ্ডিত মশাই, সুভাষকে একশ দিলেন? কাব্যতীর্থ হেসে বললেন, "একশোই দিলাম, কারণ একশোর মধ্যে একশো দশ দেওয়া যায় না।"

এমনি সময়ে এক আত্মীয়গৃহে সহসা চোখে পড়লো বিবেকানন্দের রচনাবলী। কয়েক পাতা পড়েই তিনি চম্‌কে উঠলেন। এই তো তাঁর পথ। ঠিক এই জিনিসই তো তিনি চাইছিলেন।

কৃষ্ণনগর স্কুলের সেরা ছাত্র হেমন্ত সরকারকে বেণীমাধববাবু পাঠালেন সুভাষচন্দ্রের কাছে। তাঁর কাছে কলকাতার বিপ্লবীদের কথা শুনলেন সুভাষচন্দ্র। দেশের স্বাধীনতার জন্য এই বিপ্লবীরা ফাঁসী, কারাগার, নির্বাসন কোন কিছুকেই ভয় করেন না।

তরুণ সুভাষচন্দ্র বুঝলেন পরাধীন দেশের মুক্তি সাধনাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। দেশ মানে তো নদী, পাহাড় নয়, মানুষ।

"মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, আমার প্রাণ"—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তখন তাঁরও প্রাণের কথা।

মানুষের সেবাতেই জীবন দিতে হবে এই তাঁর পণ। সে সুযোগ এল। অতি দরিদ্র এক বাঙালী মুহুরী মারা গেলেন বসন্তরোগে। মৃতের সৎকারের লোক নেই। ভয়ে কেউ কাছে আসতে চায় না। সাহসী সুভাষচন্দ্র এগিয়ে গেলেন।

সেবা কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলছিল তাঁর পড়াশুনো। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পেলেন বৃত্তি। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। আর পাঁচটা ছেলের মত তিনি নন। কোন কিছুতেই তাঁর লোভ নেই। বিবেকানন্দের প্রভাব ভালভাবেই তাঁর উপর পড়েছিল। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। ঠিক করলেন সন্ন্যাসী হবেন। কিন্তু শেষ অবধি ফিরে আসতে হয় বাড়ীতে। আবার পরীক্ষা, আবার কলেজ যাত্রা। প্রেসিডেন্সীর এক অধ্যাপক ওটেন ভারতীয়দের সম্পর্কে হীন মন্তব্য করলে উচিত শিক্ষা দেন। ফলে কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। কিন্তু ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় আবার কলেজে ভর্তি হন। ভালভাবে বি. এ. পাশ করে বিলাত যান আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে। সামান্য কয়েক মাসের পড়াশোনাতেই আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। আর ইংরেজ ছেলেদের হারিয়েই ইংরাজীতে পান সবচেয়ে বেশী নম্বর। আই. সি. এস.-এর চাকরী কিন্তু তিনি নিলেন না। কারণ তিনি যে বিবেকানন্দের শিষ্য। ভোগ, সুখ আরাম তো তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা আর দুঃখী মানুষের সেবা।

তখন ভারতে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন তরুণ সুভাষচন্দ্র। তিনি তাঁকে পাঠালেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে। তারপরের ইতিহাস ত্যাগের, সংগ্রামের, দেশের জন্য অশেষ দুঃখবরণের। ইংরেজ তাঁকে ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে নির্বাসিত করে। কঠিন রোগে তাঁর জীবন যাবার উপক্রম হয়। চিকিৎসার জন্য চলে যান ইউরোপ। ফিরে আসেন কংগ্রেসের সভাপতিরূপে।

স্বাধীনতা লাভের উপায় নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধ বাধে। তাঁকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়। ওদিকে তখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ বেধেছে। ইংরেজ মার খাচ্ছে জার্মানীর কাছে। সুভাষচন্দ্র দেখলেন এই সুযোগ। বিদেশ থেকে ইংরেজকে আঘাত করতে হবে। তবে ভারতের স্বাধীনতা আসবে।

কিন্তু দেশ ছেড়ে যাবেন কি করে? এলগিন রোডের বাড়ীতে তিনি বন্দী। পুলিশের লোক ঘিরে আছে বাড়ী। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করলেন সুভাষচন্দ্র। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে। ছদ্মবেশে পালালেন তিনি। তাঁর ছদ্মবেশ কখনও ফেজ টুপি পরা মৌলবী জিয়াউদ্দীনের, কখনও নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরা ইটালীয়ানের। ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। শুধু মনে পড়ে যায়, মোগলের চোখে ধুলো দিয়ে শিবাজীর আগ্রা থেকে পলায়নের কথা।

জাপানে উপস্থিত হয়ে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের ভার নিলেন সুভাষচন্দ্র। তৈরী হল নতুন করে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ।' সেই ফৌজ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলো। তাদের নেতাজী, সুভাষচন্দ্র। এই "নেতাজী" নামেই সুভাষচন্দ্র ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

[নেতাজী একটি নাম ঃ এ নাম স্মরণে
একটি বিস্ময়কর সংগ্রামের ইতিহাস জেগে ওঠে মনে।
একটি জীবন নয়—একখানি ইতিহাস বিরাট বিপুল ;
পাতায় পাতায় তার জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা একটি ব্যাকুল
অশ্রান্ত প্রাণের কথা চির গতিময় ;
বাধা বিঘ্ন পদে পদে, মৃত্যু সাথে ঘটে যার নিত্য পরিচয়।
সম্ভ্রমে নোয়ায়ে শির মৃত্যু তার করে অভ্যর্থনা ঃ
দুর্জয় দুর্বার গতি সে চলে অপ্রতিহত
অন্তরে কী নিঃসীম বেদনা !

—শান্তশীল দাশ]

দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ

কলকাতায় শিবাজী উৎসব। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন মারাঠা বীর শিবাজীর উদ্দেশ্যে একটি কবিতা—

"কোন দূর শতাব্দের, কোন এক অখ্যাত দিবসে,
নাহি জানি আজি,
মারাঠার কোন শৈলে, অরণ্যের অন্ধকারে বসে,
হে রাজা শিবাজী;
তব ভাল উদ্ভাসিয়া, এ ভাবনা তড়িৎ
এসেছিল নামি,—
'এক ধর্মরাজ্য' পাশে 'খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত'
বেঁধে দিব আমি।"

পরাধীন ভারতের মানুষের প্রাণে স্বদেশপ্রেম জাগাতে, বাল গঙ্গাধর তিলক "শিবাজী উৎসবের" সূচনা করেন। দেখতে দেখতে সে উৎসবের সাড়া পড়ে যায় সারা ভারতবর্ষে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অতি দরিদ্র শিক্ষক গঙ্গাধর পন্থের ছেলে তিলক। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুলাই মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি গ্রামে তাঁর জন্ম। অতি অল্প বয়সে মা মারা যান। সংস্কৃত ও গণিতে তিলকের সহজাত প্রতিভা ছিল। শিক্ষক মশাই বোর্ডে যখন অঙ্ক দিতেন, বালক তিলক মনে মনে কষে তার সঠিক উত্তর বলে দিতেন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে তিলক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন, ফল বেরুনোর আগেই বাবার মৃত্যু হল। অসহায় কিশোর তিলক, ডেকান কলেজে ভর্তি হলেন। কলেজে এসে দেখলেন, ছাত্ররা পরীক্ষা পাশের জন্য কেবল বই মুখস্থ করছে। পড়ে পড়ে দেহ ক্ষীণ, সব কাজের অযোগ্য। তিনি ঠিক করলেন, আগে স্বাস্থ্য, তারপর সবকিছু। দেশ ও দশের জন্য যদি কাজ করতে হয়, তবে দেহকে নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান করতে হবে। তাই বই মুখস্থ ছেড়ে, সাঁতার কাটা, নৌকা বাওয়া শুরু করলেন। ফলে এফ. এ. পরীক্ষায় ফল ভাল হল না। এরপর অবশ্য

এমন মন দিয়ে পড়া আরম্ভ করলেন যে, বি, এ পাশ করলেন প্রথম শ্রেণীতে। আইন পরীক্ষার ফলও খুব ভাল হল।

এমনি সময়ে দারুণ দুর্ভিক্ষে, মহারাষ্ট্রে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ মারা গেল। তিলক বুঝলেন, পরাধীনতাই এর জন্য দায়ী। দেশকে স্বাধীন করতে হলে, দেশের মানুষকে জাগাতে হবে, তার জন্য দরকার শিক্ষার। সে শিক্ষা দিতে হবে মাতৃভাষায়। এই উদ্দেশ্যে গড়ে তুললেন, ডেকান এডুকেশান সোসাইটি। প্রতিষ্ঠিত হল, ফার্গুসন কলেজ। তিলক এই কলেজে সংস্কৃত, গণিত ও বিজ্ঞান পড়াতেন। এই সময় 'ওরিয়ন' নামে একটি গবেষণা পত্রে, তিলক তাঁর অগাধ গণিতবিদ্যার সাহায্যে প্রমাণ করেন, বেদের রচনাকাল খ্রীষ্টজন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। এমনি সময়ে হঠাৎ তিলককে কারাগারে বন্দী করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, পুণার প্লেগ দমনকারী অফিসার মি. ব্যাণ্ডের হত্যাকারী, দামোদর চাপেকর "শিবাজী উৎসব" থেকে হত্যার প্রেরণা পেয়েছেন। চারিদিকে হুলস্থূল পড়ে গেল। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার রানী ভিক্টোরিয়াকে অনুরোধ করেন তিলকের মুক্তির জন্য। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিলক দেশকে পরশাসন মুক্ত করার জন্য পথের সন্ধান করছিলেন।

১৯০১ সালে বসে কলকাতা কংগ্রেস। তিলক কলকাতায় এসে বেলুড় মঠে দেখা করেন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে। বিবেকানন্দ বলেন, দেশের দরিদ্র দুঃখী মানুষ মুচি, মেথর, চাষী মজুরদের বাদ দিয়ে স্বরাজ-সাধনা সম্ভব নয়। পথের সন্ধান পেলেন তিলক। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলায় তখন জেগে উঠেছে জাতীয় চেতনা। শ্রীঅরবিন্দ এসেছেন বাংলায়। গড়ে উঠেছে বিপ্লবী দল। বাঙালী তরুণ ক্ষুদিরাম বোমা ছুঁড়েছেন অত্যাচারী ইংরেজ কিংসফোর্ডকে মারতে। ফাঁসী হয়েছে তাঁর। তাঁর সহযোগী প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেছেন। তিলক 'কেশরী' পত্রিকায় এদের উদ্দেশ্যে জানালেন শ্রদ্ধাঞ্জলি। ইংরেজ সরকার বাহান্ন বছরের সুপণ্ডিত স্বদেশ সেবককে রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী করে সুদূর ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে পাঠিয়ে দিল। আটবছর বাদে তিলক ছাড়া পেলেন। স্বাস্থ্য তখন তাঁর ভেঙে গেছে। তবু সেই অক্লান্ত যোদ্ধা ইংরেজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ছুটে গেলেন ইংল্যাণ্ডে। ভারত সচিব মণ্টেগুর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলেন, ইংরেজ শাসন সংস্কারের

নামে ভারতবাসীকে ধোঁকা দিতে চায়—স্বাধীনতা দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। দেশে ফিরে তিনি যখন নতুন করে সংগ্রামের কথা চিন্তা করছেন, ঠিক এমনি সময়ে অকস্মাৎ সামান্য অসুখে, ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট চিরসংগ্রামী তিলকের মহাজীবনের অবসান ঘটে। ইংরেজের 'উপাধী' তিনি পাননি, কিন্তু তাঁর স্বদেশবাসী পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে দিয়েছেন 'লোকমান্য' নাম। বাঙালী জাতি কলকাতার গড়ের মাঠে তিলকের মূর্তি স্থাপন করে এই মহাজীবনের উদ্দেশে নিবেদন করেছে, প্রাণের প্রণাম।

'সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো
তোমায় ভালবেসে।'

—রবীন্দ্রনাথ

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগের কথা। সারা ভারত জুড়ে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে। মহাত্মা গান্ধী ডাক দিয়েছেন সকলকে। সেই ডাকে, দলে দলে ছেলেরা বেরিয়ে এসেছে, কেরাণী তৈরীর কারখানা, স্কুল কলেজ ছেড়ে। উকিল, ব্যারিষ্টারেরা ছেড়েছেন কোর্ট-কাছারী। আসামের চা-বাগানের গরীব কুলীরাও পেছিয়ে রইল না। তারাও বেরিয়ে পড়লো, চা-বাগান ছেড়ে। ভুলিয়ে ভালিয়ে, মিথ্যা লোভ দেখিয়ে, তাদের আনা হোত, চা-বাগানে। রাতদিন খাটত, পেট ভরে খেতেও পেত না। অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে, তারা বেরিয়ে এল দলে দলে। যাবে করিমগঞ্জ রেল ষ্টেশন হয়ে চাঁদপুর জাহাজঘাটে। চাঁদপুরে ঘটলো সেই ভয়ানক ব্যাপার। ইংরেজ শাসক পাঠিয়ে দিল হিংস্র সেনাদল। তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই গরীব অসহায় কুলীদের উপর। কত লোক যে মারা গেল, কত লোকের যে হাত পা ভাঙলো তার ঠিক নেই। সারা ভারত বেদনায় মূক হয়ে গেল। সেদিন কলকাতা থেকে ছুটে এলেন এক বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। তিনি ছিলেন আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কর্মচারী সংঘের সভাপতি। সেই সময় রেলওয়ের কর্মচারীরা খুব কম মাইনে পেতেন। অনেকদিন ধরেই তাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। এবার ঠিক করলেন, এই গরীব কুলীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ধর্মঘট করবেন। ধর্মঘট সফল করার জন্য কলকাতার সেই ব্যারিষ্টার, তাঁর সর্বস্ব পণ করলেন। ধর্মঘট চললো তিনমাস ধরে। পঁচিশ হাজার কর্মী ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের সকলের খাওয়া পরার দায়িত্ব, সেই ব্যারিষ্টারটিকেই নিতে হয়েছিল। তখন তিনি নতুন ব্যারিষ্টার। টাকাকড়ি বিশেষ জমাতে পারেন নি। তাই জমিজমা বিক্রি করে, ধর্মঘটের খরচ চালিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত চল্লিশ হাজার

টাকার ঋণের বোঝা তাঁর মাথায় চাপে। দেশের লোক, এই ত্যাগী মানুষটিকে 'দেশপ্রিয়' আখ্যায় ভূষিত করেন।

এই 'দেশপ্রিয়' উপাধি যাঁকে দেওয়া হল তিনিই যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। চট্টগ্রামের সুসন্তান ইনি। পিতা যাত্রামোহন সামান্য অবস্থা থেকে নিজের যোগ্যতায় প্রচুর অর্থ ও যশের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মী।

ধনী পিতার সন্তান হিসাবে যতীন্দ্রমোহনের বাল্যকাল কেটেছিল। কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় বাবার ইচ্ছাতেই বিলাতে যান। কেম্ব্রিজ থেকে বি. এ. ডিগ্রী নিয়ে, লণ্ডনের 'গ্রেজ-ইন' থেকে ব্যারিষ্টার হন।

ছেলেবেলা থেকেই যতীন্দ্রমোহন ছিলেন খেলার ভক্ত। বিলেতে থাকতেই ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস খেলায় খুব নাম করেছিলেন। নিয়মিত খেলা-ধূলার ফলে, তাঁর ছ' ফুট লম্বা শরীর পুষ্ট ও কান্তিমান হয়ে ওঠে।

পঁচিশ বছর বয়সে, কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করলেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই, ফৌজদারি মামলায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। ইংরেজী ও বাঙলা দু' ভাষাতেই, খুব সুন্দর বক্তৃতা করতে পারতেন। ফলে, জজসাহেবেরা সহজেই প্রভাবিত হতেন। প্রচুর টাকা রোজগার করলেও, টাকার প্রতি তাঁর কোন মমতা ছিল না। দেশের কাজই তাঁর কাছে ছিল বড় কথা। একটা ঘটনা বলি। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ধর্মঘট চালাতে গিয়ে তাঁর অনেক টাকা দেনা হয়েছিল। এমনি সময় বোম্বাই থেকে তাঁর ডাক এল বিখ্যাত 'বাওলা' মোকদ্দমা চালানোর জন্যে। প্রায় হাজার পঞ্চাশ টাকা 'ফি' পাওয়া যেত। কিন্তু যতীন্দ্র-মোহন বোম্বাই যেতে রাজী নন। কারণ ওই মামলার দিনেই বাঙলা-দেশের আইনসভায় ইংরেজ মনোনীত মন্ত্রীদের বেতন নাকচ করার বিল আনার কথা। তিনি চলে গেলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলের একটা ভোট কমে যাবে। তিনি যে ওই দলেরই একজন নেতা! বোম্বাইয়ে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলেন, মোকদ্দমা নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। স্বয়ং দেশবন্ধু এসে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু যতীন্দ্রমোহন অটল।

আসাম-বেঙ্গল রেলপথের ধর্মঘটের ব্যাপারে যতীন্দ্রমোহনের নাম, সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করতে গিয়ে যতীন্দ্রমোহন ধরা পড়েন। তিন মাসের জন্য তাঁর জেল হয়ে যায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। মহাত্মা গান্ধী, চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্যের খবর পেয়ে চট্টগ্রাম আসেন। যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে দু' লাখের বেশী লোক গান্ধীজীকে স্বাগত জানায়। গান্ধীজী তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে দুটি প্রবন্ধ লিখে চট্টগ্রাম ও যতীন্দ্রমোহনের প্রশংসা করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দল গঠন করলে, যতীন্দ্রমোহন সে দলে যোগ দেন। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত দেশবন্ধুর মৃত্যু ঘটে। মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এসে যতীন্দ্রমোহনকে বলেন, "বাঙলার নেতৃত্ব তাঁকেই নিতে হবে।"

যতীন্দ্রমোহন হলেন স্বরাজ্য দলের নেতা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি, আর কলকাতার মেয়র। একবার নয় পাঁচ-পাঁচবার কলকাতার মেয়র হয়েছেন যতীন্দ্রমোহন। এ সম্মান আর কারো ভাগ্যে জোটেনি।

দেশের কাজে বার বার কারাবরণ, দুশ্চিন্তা ও অতিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ডাক্তারের পরামর্শে তিনি চিকিৎসার জন্য বিলেত যান। কিন্তু বিলেত থেকে ফেরার সময়, জাহাজ বোম্বাই শহরে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রেফতার হন। নানা জেলে ঘুরিয়ে, তাঁকে রাঁচীতে অন্তরীণ করে রাখা হয়। কিন্তু অকস্মাৎ এই বীর দেশপ্রেমিকের জীবন-দীপ নিভে যায়, একান্ত অকালে—মাত্র ৪৮ বছর বয়সে।

["আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
ছুটে তো ছুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।"
—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর]

দুঃসাহসী বাঙালী বীর

গভীর রাত। ব্রেজিলের রাজধানী রাও-ডি-জেনিরো শহরের উপর গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। গোলা ছুঁড়ছে, স্বাধীন ব্রেজিল প্রজাতন্ত্রের নৌ-সেনারা। অবাক কাণ্ড। কেন এমন হল। দুশ্চিন্তায় ব্রেজিলের প্রধান সেনাপতি সারারাত পাইচারী করে কাটালেন। খবর পাওয়া গেল। পর্তুগীজ বোম্বেটেদের কারসাজি। অনেক কাল ধরে তারা ব্রেজিল দখল করে লুঠপাট চালিয়েছে। ব্রেজিলের মানুষ শেষ পর্যন্ত তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে ছেড়েছে। সেই রাগ তারা ভোলেনি। টাকা ঘুষ দিয়ে তারা ব্রেজিলের নৌ-সেনাদের দলে টেনে সদ্য স্বাধীন ব্রেজিলকে ধ্বংস করতে নেমেছে। কুড়িখানা যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে তারা ঘিরে ফেলেছে রাও-ডি- জেনিরো শহরকে। ডাঙায় দাঁড়িয়ে স্বাধীন ব্রেজিলের সেনারা জানে প্রাণে লড়ছে। কিড রণপোত থেকে ছোঁড়া গোলার আঘাতে তাদের সৈন্য-সংখ্যা কমছে প্রতি মিনিটে। এদিকে খবর পাওয়া গেল সাণ্টোস, সাওপাওলো প্রভৃতি বন্দরও আক্রান্ত। গোলার ঘায়ে চুর্ণ হচ্ছে।

বিদ্রোহী সেনারা এবার রণপোত ছেড়ে ডাঙায় নেমে এল। রাও-ডি জেনিরোর শহরতলী "নেকথেরো" অঞ্চলে হাতাহাতি লড়াই চললো। ঘণ্টাতিনেক মরণপণ লড়াই ; এরপর ব্রেজিলের সেনারা হটে এল।

প্রধান সেনাপতি এক রাতে যেন বুড়ো হয়ে গেছেন। কপালে দেখা দিয়েছে গভীর রেখা। মন্ত্রণাকক্ষে সেনাপতিদের ডেকে বললেন, আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে দেশকে এই দারুণ বিপদে রক্ষা করেন। সকলে মাথা নীচু করলেন। করার আর কিছু নেই। এবার পরাজয়

নিশ্চিত। আর পরাজয় মানেই আবার পর্তুগীজের দস্যুদের দাসত্ব। এমনি সময় ত্রিশ-বত্রিশ বছরের একজন তরুণ লেফটেন্যাণ্ট লাফ দিয়ে উঠে বললেন—আমায় পঞ্চাশজন সৈন্য দিন, যারা মরতে ভয় পায় না। সেনাপতি অবাক হয়ে বললেন,— সেকি। তুমি বিদেশী—তুমি কেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ছুটে যাচ্ছ? এদেশ স্বাধীন থাকলো কি পরাধীন হ'ল তাতে তোমার কি এসে যায়? যুবকটি তেজের সঙ্গে বললেন,—আমি ভারতীয় আমি বাঙালী, তবু যে দেশের নুন আমি খেয়েছি, যে দেশ আমাকে আহার দিয়েছে, বাসস্থান দিয়েছে, মান-সম্মান দিয়েছে—সে দেশের জন্য মরতে আমি প্রস্তুত। প্রধান সেনাপতি সেই তরুণ সেনানীকে পঞ্চাশজন সেরা সৈন্য দিলেন।

সেই তরুণ যুবা ঘোড়ায় চড়ে খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে সৈন্যদের আহ্বান করে বললেন,—এস দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দেবে। বীর সেনারা কালবৈশাখীর ঝড়ের মত শত্রু সেনার মধ্যে ঝাপিয়ে পড়লো। ইতিহাসে অনেক তুচ্ছ লড়াইয়ের কথা বড়-অক্ষরে লেখা হয়েছে। রাও-ডি-জেনিরোর শহরতলীর সেই অলৌকিক যুদ্ধের কথা কজন জানেন? এক হাতে পিস্তল আর একহাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন বাঙালী বীর। ডাঙার শত্রুসৈন্যদের কচুকাটা করে মই লাগিয়ে বিদ্রোহী নৌসেনাদের জাহাজে উঠে কামান দখল করে নিলেন। শহরে গোলা বর্ষণ বন্ধ হ'ল। বিদ্রোহীরা পরাজিত ও বন্দী হল। কিন্তু কোথায় সেই বীর বাঙালী,— তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সারা ব্রেজিলে সেদিন জয়ের আনন্দের সঙ্গে শোকের ছায়া নেমে এল।

শোকসভার আয়োজন হচ্ছে। এমনি সময় ফিরে এলেন সেই বীর সৈনিক। একি চেহারা হয়েছে তাঁর, বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে! মাথার সব চুল পাকা। কেমন করে এমন হল? জানা গেল শত্রু যখন পরাজিত, কয়েক ঘণ্টায় নিদারুণ যুদ্ধে তাঁর ইস্পাতের মত কঠিন স্নায়ুও বিকল হয়ে যায়, অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। আর তাঁর দেহের উপর শত্রু সৈন্যের মৃতদেহের স্তূপ জমা হয়। জ্ঞান ফিরলে দেখেন, বেরুবার কোন উপায় নেই। উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় মাথার সব চুল সাদা হয়ে যায়। মৃতদেহ সাফ করার লোকেরা এসে তাঁকে উদ্ধার করে। [দক্ষিণ আমেরিকা যখন বাঙালী বীর সুরেশ বিশ্বাসের বীরত্বে মুগ্ধ, ঠিক সেই

সময় ১৮৯৩ সালে আর এক বীর বাঙালী স্বামী বিবেকানন্দের বিজয় ডঙ্কা বাজছে উত্তর আমেরিকায়] সারা ব্রেজিলে এই বীর সৈনিককে জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানালো। কর্ণেল পদে উন্নীত হলেন ওই বিদেশী বীর। ঐ বিদেশীর নাম সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। নদীয়া জেলার নাথপুর গ্রামে ১৮৬১ সালে এর জন্ম। আর পাঁচটা ছেলের মত লেখাপড়া শিখে চাকরী করুক এই চেয়েছিলেন তাঁর বাবা গিরীশচন্দ্র। কিন্তু স্কুলের বাঁধাধরা জীবন সুরেশচন্দ্রের ভাল লাগেনি। ভাল লাগে ইচ্ছামতীতে নৌকা ভাসিয়ে দাঁড় টানতে, মাছ ধরতে। বেশ লাগে গাছে উঠে পাখীর ছানা ধরতে। এর জন্য বার বার বিপদ ঘটেছে। একবার হ'ল কি— সুরেশচন্দ্রের বয়স তখন বছর এগারো। পাখীর ছানা পাড়তে গাছে উঠেছেন। ফোঁস করে উঠলো এক বিষধর সাপ—পাখীর ডিমের লোভে সাপটা গাছে উঠেছিল। ডানপিঠে সুরেশচন্দ্র ভয় না পেয়ে সাপের ফণা মুঠো করে ধরলেন। পকেটে ছিল আম কাটা ছুরি, দাঁত দিয়ে সেই ছুরি খুলে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সাপের মাথা কেটে ফেললেন। বাড়ী ফিরলেন পাখীর ছানা আর সাপের মাথা নিয়ে। বাড়ীর লোক তো ছেলের কাণ্ড দেখে অবাক।

একদিন ঘটলো আর এক ব্যাপার। সুরেশচন্দ্র দুই বন্ধুর সঙ্গে নদীতে মাছ ধরে ফিরছেন, এমনি সময়ে এক মস্ত দাঁতালো শূকর এসে পড়লো সামনে। শূকরটাকে তাড়া করেছিলেন স্থানীয় নীলকর সাহেবেরা। তাঁরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিলেন শূকরটার পিছনে। ক্ষ্যাপা শূকর ঝাঁপিয়ে পড়লো সুরেশের উপর। হাতের ছিপ দিয়ে পিটিয়ে শূকরটাকে কাবু করে ফেললেন সুরেশচন্দ্র। চৌদ্দ বছরের ছেলের সাহস দেখে সাহেবরা তো অবাক। ছেলেটির নাম ধাম লিখে নিলেন। আমন্ত্রণ করলেন নীল কুঠিতে। ছেলের মতি গতি দেখে গিরিশচন্দ্র সুরেশকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। ভর্তি করে দিলেন লণ্ডন মিশন স্কুলে। দেশ তখন পরাধীন। গড়ের মাঠে ফিরিঙ্গী সাহেবরা বাঙালীদের ঘৃণা করে নেটিভ নিগার, কালা আদমী বলতো। সুরেশচন্দ্রের প্রাণে বাজতো অপমান। তাই সুযোগ পেলেই ফিরিঙ্গীদের নাক ভেঙ্গে দিতেন ঘুষি মেরে। এমনি সময় একটা অঘটন ঘটে গেল। খ্রীস্টান মিশনারী স্কুলের খ্রীষ্টান ছেলেদের সঙ্গে মিশে ধারণা হল বিলাত না গেলে জীবনটা বৃথা। কাজেই সুরেশচন্দ্র খ্রীষ্টান হলেন। ফল ভাল হল না। বাড়ী থেকে বিতাড়িত হলেন।

হোটেল বয়ের চাকরী নিলেন। ভালো লাগলো না। শেষে জাহাজের ডেকে যাত্রী হয়ে গেলেন রেঙ্গুন। সেখান থেকে মাদ্রাজ। কোথাও চাকরী পেলেন না। ফিরে এলেন কলকাতায়। না খেয়েই মারা যেতেন কিন্তু সুরেশচন্দ্রের স্নেহময়ী মা গোপনে ছেলেকে সাহায্য করতেন।

একদিন খিদিরপুর ডকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আলাপ হয়ে গেল বি. এস. এন জাহাজ কোম্পানীর এক ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন তাঁর জাহাজে স্টুয়ার্টের কাজ দিলেন। লণ্ডনে পৌঁছে স্টুয়ার্টের কাজ ছেড়েছিলেন সুরেশচন্দ্র। বাসা নিলেন লণ্ডনের ইষ্টএণ্ডে—যেমন নোংরা তেমন মন্দ লোকের বাস এখানে। বিলাতের সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে দেরি হয়নি। দেখলেন, এখানে না খেয়ে মরলেও কেউ আহা বলে না। ভিক্ষা করাও বে-আইনি। খবরের কাগজ বিক্রি, মুটে গিরি করলেন, পেট ভরে না। শেষে হলেন ফেরিওয়ালা। একদিন 'কেণ্ট' অঞ্চলে খেলনা, পুতুল ফেরি করছেন, দেখলেন সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। সার্কাসের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে চাকরী চাইলেন। সাহেব ম্যানেজার তাঁর চেহারা দেখে বিশ্বাসই করতে চাইলো না যে সুরেশচন্দ্র 'বার' রিং-এর খেলা দেখাতে পারেন। সত্যি কথাই, সুরেশচন্দ্রের চেহারাটা ঠিক পালোয়ানদের মত লম্বা চওড়া ছিল না। রোদে পোড়া তামাটে রং। কিন্তু দেহের কাঠামোটা ছিল ইস্পাতের মত শক্ত। সাহেব একটা কৌশল করলেন যাতে চাকরী দিতে না হয়। বললেন, সুরেশচন্দ্র যদি তাঁর দলের সেরা খেলোয়াড়কে কুস্তিতে হারাতে পারেন তাহলে তিনি চাকরী পাবেন। আশ্চর্যের কথা, সুরেশচন্দ্র দৈত্যাকৃতি খেলোয়াড়কে সহজেই কাবু করে ফেললেন। তখন তাঁকে আর চাকরী না দিয়ে উপায় রইল না। পনেরো শিলিং অর্থাৎ টাকা বারো করে মাইনে হল তাঁর। সার্কাসের দলের সঙ্গে সারা হল্যাণ্ড ঘুরলেন। বাঁধা-ধরা স্কুল-কলেজের ক্লাস ভাল না লাগলেও পড়াশুনা করতে ভালবাসতেন সুরেশচন্দ্র। চাকরীর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে এবার পড়াশুনায় মন দিলেন। রসায়ন, গণিত আর জ্যোতির্বিদ্যার বই পড়লেন প্রচুর। সার্কাসের এক জার্মান মহিলার কাছে জার্মান ও ফ্রাঞ্চ শিখলেন।

এমনি সময় তাঁর আলাপ হয়ে গেল প্রফেসর জামবাকের সঙ্গে। জামবাক সাহেব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ থেকে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী সংগ্রহ করে পোষ মানিয়ে সার্কাস দলে বিক্রি করতেন। জামবাক সাহেবের

ভারি পছন্দ হয়ে গেল এই তরুণ বাঙালী ছেলেটিকে। সুরেশচন্দ্রকে তাঁর পশুশালায় চাকরী দিলেন। আগ্রহের সঙ্গে সুরেশচন্দ্র এই কাজ নিলেন। ১৮৮২ সালে লণ্ডনে বন্য পশু প্রাণীর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের খেলা দেখিয়ে সোনার মেডেল পান সুরেশচন্দ্র। সুরেশচন্দ্রর খ্যাতি তখন সারা ইউরোপে। জার্মানীর নাজেন বাগ সাহেব তাঁর পশুশালায় বেশী মাইনেতে তাঁকে নিযুক্ত করলেন। সুরেশচন্দ্র এলেন হামবুর্গে। তিনি এখন শুধু সার্কাসের খেলোয়াড় নন। বেশ নামী মানুষ। নানা ভাষায় দখল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চর্চা করেন। ইউরোপের বিখ্যাত পণ্ডিতদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এমনি সময় হঠাৎ ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকা চলে এলেন সুরেশচন্দ্র, আমেরিকার বিখ্যাত ওয়েল সাহেবের সার্কাস দলে যোগ দিতে। এই ওয়েল সাহেবের দলের সঙ্গেই এসেছিলেন মেক্সিকো। সেখান থেকে ব্রেজিল। এ দেশের ভাষা পর্তুগীজ। অল্পদিনের মধ্যে ভাষা শিখে নেন সুরেশচন্দ্র। এ ভাষায় এত ভাল বক্তৃতা করতে পারতেন যে ও দেশের নামী পত্রিকা 'লা ক্রনিকা" এই বাঙালী বক্তার সুখ্যাতি করেছিল। ভাষা শিক্ষা ব্যাপারে সুরেশচন্দ্রের সহজাত দক্ষতা ছিল। ইংরাজী ফ্রেঞ্চ ছাড়া জার্মান, ডেনিস, ডাচ, পর্তুগীজ ও স্প্যানিস ভাল জানতেন।

বাঙালী তরুণের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে ব্রেজিলের সরকার তাঁকে সরকারী পশুশালায় অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। অনেকদিন ধরে সুরেশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের। সে ইচ্ছা তাঁর এবার পূর্ণ হল। বাড়ীর গবেষণাগারে বসে রসায়ন ও গণিত নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর রক্তে ছিল অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তা। ঘরে বসে কাজ করার ধৈর্য তাঁর ছিল না। তাই হঠাৎই একদিন ব্রেজিলের সৈন্য দলে নাম লেখালেন। যোগ্যতার জোরে সাক্রাক্রুজের কর্পোরাল পদে নিযুক্ত হন। সেখান থেকে আসেন রাও-ডি-জেনিরোয় সরকারী হাসপাতালের পরিচালক হয়ে। এখানে এসে প্রতিভাবান সুরেশচন্দ্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই পড়ে ডাক্তারি বিদ্যা শিখে নেন। এ সময় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের জন্য গবেষণাও শুরু করেন। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধু বিদেশী বলে সুরেশচন্দ্রের যথাযোগ্য উন্নতি হয়নি চাকরীতে। সে সুযোগ এল যেদিন বিদ্রোহী নৌ-সেনারা রাতের আঁধারে গোলাবর্ষণ শুরু করলো রাজধানী রাও-ডি-জেনিরোর উপর। চিরচঞ্চল

সুরেশচন্দ্র ব্রেজিলের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বীরের মত লড়ে বিজয়ী হয়ে গেলেন। পেলেন সারা ব্রেজিলের মানুষের কাছে সাদর সম্বর্ধনা। উন্নীত হলেন কর্নেল পদে, যা পরাধীন ভারতে বাঙালীর ছেলের কাছে স্বপ্ন ছিল।

এই বাঙালী বীর ভেবেছিলেন,—দেশে ফিরবেন। তাঁর যশ, মান, অর্থ স্নেহময়ী জননীর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করবেন। তা আর হল না। খবর এল ছেলের কথা ভেবে ভেবে মা দেহ রেখেছেন। অভিমানে বীর পুত্র আর তার প্রাণের প্রিয় সোনার বাংলায় ফিরে এলেন না। অকালে মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে এই বীর—বাঙালীর মৃত্যু হল সুদূর ব্রেজিলে।

["যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বলরে।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
একলা চলরে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

মহাবিপ্লবী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। জার্মান সেনার হাতে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে ইংরেজ সৈন্য। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীরা চঞ্চল হলেন। এই তো সময়। কিন্তু সেরা বিপ্লবী নেতাদের যে আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে, কে নেবে এ সুযোগ ?

ঠিক এমনি সময় গভীর রাতে মাদ্রাজ শহরের মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন সারা শহরটা ঝাঁপিয়ে শব্দ হল—গুড়ুম, গুড়ুম্। বঙ্গোপ-সাগরের দিক থেকে গোলা এসে পড়তে লাগলো ইংরেজ সৈন্যদের ব্যারাকের উপর। ভয়ে ইংরাজ সৈন্যরা ছোটাছুটি শুরু করে দিলে। একটা ব্রিটিশ ক্রুজার সমুদ্রের বুকে সার্চ লাইট ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু কোথায় কি ? বঙ্গোপসাগরের কালো জলে কোন জাহাজের দেখা পাওয়া গেল না। এরোপ্লেন তখন আবিস্কার হয়েছে, ইউরোপের যুদ্ধে তাঁর ব্যবহারও চলেছে। কিন্তু জার্মান এরোপ্লেনে দশ হাজার মাইল উড়ে এসে মাদ্রাজে বোমা ফেলবে—এটা একেবারেই অসম্ভব মনে হল। কলকাতার কাগজে বড় বড় অক্ষরে মাদ্রাজে বোমা পড়ার কথা বেরুলো। জানা গেল, বোমা নয় কামানের গোলা। কিন্তু কামান এল কোথা থেকে ? ইংরেজের যুদ্ধ জাহাজগুলো সারা পৃথিবীর সাগর মহাসাগর চষে ফেলছে। তাঁদের ফাঁকি দিয়ে জার্মান জাহাজ মাদ্রাজে গোলা ফেলে যাবে, এটা সহজে বিশ্বাস করার নয়।

কদিন বাদেই জানা গেল রহস্য। চোরাবালির চড়ায় আটকে ধরা পড়ে গেল জার্মান ডুবোজাহাজ 'এমডেন।' কলকাতায় আসার পক্ষে হুগলী নদীর জেমস-মেরী চোরাবালিতে আটকে যায় 'এমডেন। সাবমেরিন বা ডুবো জাহাজের কথা তখন এদেশের লোক শোনেনি। ভারি অবাক

হল। এমডেনের জার্মান নৌ-সেনারা কিন্তু ইংরেজের হাতে ধরা দিলেন। জাহাজের মধ্যে বোমা ফাটিয়ে জলের তলায় তলিয়ে গেল।

খবরের কাগজে দারুণ হৈ চৈ পড়ে গেল। সবারই জিজ্ঞাসা জার্মান ডুবো-জাহাজ, মাদ্রাজে গোলা ফেলতে এল কেন? কোলকাতায় আসারই বা কারণ কি?

সেদিন এ প্রশ্নের উত্তর মেলে নি। পরে জানা যায়—এ ডুবোজাহাজ এসেছিল রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনা অনুযায়ী।

কে এই রাসবিহারী? বছর তিনেক আগে বঙ্গভঙ্গ রোধ হয়েছে। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে উঠে গেছে দিল্লিতে। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হাতির পিঠে চেপে দিল্লির দরবারে যাচ্ছেন। এমন সময় বিকট তুম্ তুম্ শব্দে ফাটলো বোমা। ধোঁয়া কাটলে দেখা গেল মাহুত আর ছত্রধারী এক অন্য মিত্র রাজ্যের রাজা মারা গেছেন আর বড়লাট অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন—হাতে বিঁধেছে বোমার টুকরো। না, মারা যাননি। কিন্তু বৃটিশ সিংহ উঠলো ক্ষিপ্ত হয়ে। এত বড় স্পর্ধা "নেটিভ কালা আদমীদের," সাদা চামড়ার গায়ে হাত দেয়। জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায়ই অপরাধীকে ধরতে পারলে নগদ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, ঘোষণা করা হল।

এই অপরাধী আর কেউ নন—রাসবিহারী বসু। তাঁর 'অপরাধ' তিনি দেশকে ভালবাসেন। ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজকে তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করতে চান। জন্ম তার চন্দননগরে। বাবার নাম বিনোদ-বিহারী। চাকুরী করেন সিমলার ছাপাখানায়। চন্দননগরে স্কুলে পড়েন রাসবিহারী। প্রখর বুদ্ধিমান বালক। ইতিহাস পড়তে ভাল-বাসে। যখন পড়ে দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষ বিদেশীর পদানত—মনটা বেদনায় ভরে যায়। সহপাঠী কানাইলাল দত্ত আর শ্রীশ ঘোষের সঙ্গে লুকিয়ে পড়ে বিবেকানন্দের বই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়ে কল্পনা করেন—গড়বেন অমনি সন্ন্যাসী দল।

অল্প বয়সে মা ভুবনেশ্বরী দেবীর মৃত্যু হয়েছে। বাবা সিমলায়। রাস-বিহারী চন্দনগরের গুপ্ত বিপ্লবী দলে ভিড়লেন। কলকাতায় গিয়ে বিপ্লবীদের আখড়া অনুশীলন সমিতিতে ঘুরে এলেন। বঙ্গভঙ্গ হয়েছে—সারা দেশ ইংরাজের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। বরোদা থেকে মোটা মাইনের চাকরী ছেড়ে অরবিন্দ ঘোষ এসেছেন কলকাতায়।

তাঁর 'বন্দেমাতরম' পত্রে ঘোষণা করলেন, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য।

বেরুলো 'যুগান্তর' পত্রিকা। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে আগুন ছড়াতে লাগলো। 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বৃটিশবিরোধী কথা লেখায়, তাঁকে পুলিশে ধরলো। কিন্তু কারাগারে পাঠাতে পারলো না। সহসাই অসুস্থ হলেন; ব্রহ্মবান্ধব মারাও গেলেন। অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে বোমা মরলেন ক্ষুদিরাম। ফাঁসী হয়ে গেল তাঁর। মারাঠি নেতা তিলক জয়গান করলেন এই বীর কিশোরের। সারা ভারত উদ্বেল হল বেদনায়, আবার গর্বেও। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে গুলি করে মারলো কানাইলাল। ফাঁসি হল তাঁর। জেলে তাঁকে লুকিয়ে পিস্তল দিয়ে এল শ্রীশ ঘোষ। দু'জনেই রাসবিহারীর প্রাণের বন্ধু।

ক্ষুদিরামের সূত্র ধরে ইংরেজ শুরু করলো ধর পাকড়। অরবিন্দ, রবীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র প্রমুখ সব বিপ্লবীরা ধরা পড়লেন। ইংরাজের বিচারে বিপ্লবীরা আন্দামানে নির্বাচিত হলেন। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাসের চেষ্টায় অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। কিন্তু চলে গেলেন পণ্ডিচেরী।

সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, প্রমুখ নেতাদের আন্দোলনেব ফলে বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ হলো, কিন্তু রাজধানী চলে গেল দিল্লীতে। রাসবিহারী তখন দেরাদুনে। চাকরী নিয়েছেন বনবিভাগে। গোপনে বিপ্লবের জাল বোনেন সারা উত্তর ভারতে। তাঁর চারপাশে এসে দাঁড়িয়েছেন—আমির-চাঁদ, বালমুকুন্দ কর্তার সিং, আন্দদবিহারী, বিষ্ণুগণেশ পিংলের মত নির্ভীক বীরের দল।

রাসবিহারী ঠিক করলেন, আঘাত করবেন একেবারে মোক্ষম জায়গায়। চুনো পুঁটি নয়—রাঘব বোয়ালই এবার লক্ষ্য। দিল্লী প্রবেশের দিন বড়-লাটকে বোমার ঘায়ে ধরাশায়ী করবেন। চন্দননগরে তাঁর দলের মণীন্দ্র নায়েক অসাধারণ কৃতী ছাত্র—তৈরী করেছেন বোমা। সে বোমা নিয়ে আসেন বসন্ত বিশ্বাস। বড়লাটের শোভাযাত্রার সময় বোমা ছোঁড়েন দু'জনেই।

তারপরের দৃশ্য চমৎকার। বনবিভাগের কর্মচারী রাসবিহারী বক্তৃতা

করছেন দেরাদুনে। বড়লাটকে বোমা মারার জন্য তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছেন আততায়ীকে। বড় প্রীত হ'ল ইংরাজ শাসক রাজভক্ত রাসবিহারীর প্রতি। তবে শেষ রক্ষা হল না। আমাদের দেশে ইংরাজ-ভক্ত বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীর অভাব কোনদিন হয়নি। ইংরাজ জানলো কপট রাজ-ভক্তটি হলেন রাসবিহারী। পুরস্কার ঘোষণা করা হল। দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া হল রাসবিহারীর ছবি। কেউ সন্ধান দিলেই পাবে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার। আত্মগোপন করলেন রাসবিহারী।

এলাহাবাদ ষ্টেশনে দেখা গেল সালোয়ার কোর্তা পরা এক পাঠান—ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে এক বাঙালীবাবুকে প্রশ্ন করছে—এ কিসের ইস্তাহার বাবু? বাঙালী বাবুটি বুঝতেও পারলেন না। প্রশ্নকর্তা স্বয়ং রাসবিহারী।

পুলিশ খবর পেয়েছে রাসবিহারী কলকাতায় এসেছেন। আশ্রয় নিয়েছেন বাদুড় বাগানে বিপ্লবীদের আস্তানায়। এমন সময় আধকামানো মাথায় মস্ত টিকি, কপালে তিলক, গায়ে নামাবলী এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুলিশের বড় কর্তা টেগার্ট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে সংস্কৃত মেশানো শুদ্ধ বাংলায় —হ্যাঁ সাহেব, ঠনঠনে যাব কোন রাস্তায় বলতে পার?

সাহেব পথ বাৎলে দিলে, পণ্ডিত মশায় খড়ম খট্‌খট্ করে চলে গেলেন। টেগার্ট জানতেও পারলেন না যাকে ধরতে এসেছেন, তিনিই ইনি।

রাগে মাথায় চুল ছিঁড়তে লাগলেন টেগার্ট যখন বুঝলেন রাসবিহারী কি বোকাই না বানিয়েছেন। তাই চন্দননগরে রাসবিহারীর পৈতৃক বাড়ী ঘেরাও করে বসে রইলেন ভোর রাত থেকে—যেন একটা মাছিও না গলতে পারে।

শুধু ময়লার হাঁড়ী মাথায় সারা গায়ে ময়লা মাখা মেথরটাকে দেখে নাকে রুমাল দিয়ে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে হায়, হায় করেছিলেন—বুঝতে পারেন নি ঐ মেথরই রাসবিহারী।

ছদ্মবেশ ধারণে রাসবিহারী ছিলেন পটু। তাই তিন বছর ধরে সারা ভারতব্যাপী এক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন। সুযোগও এসে যায়। বাধে বিশ্বযুদ্ধ।

রাসবিহারী বাংলার বিপ্লবীদের নেতা বাঘা যতীনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রামকৃষ্ণদেবের লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটিতে মিলিত হন তাঁরা। ঠিক হয় বৃটিশশক্তিকে আঘাত করতে হবে দুদিক থেকে।

ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে তাদের বিদ্রোহী করতে হবে, আর বিদেশ থেকে জার্মানীর অস্ত্র আমদানী করে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিতে হবে।

বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর দায় নেন বাঘা যতীন। আর ভারতীয় সৈন্যদের ব্যারাকে ব্যারাকে বিদ্রোহের বাণী প্রচারের বিপজ্জনক দায় নেন রাসবিহারী। পর্তু-উর্দু-হিন্দী-ইংরাজীতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন তিনি। এ কাজে তাঁর সহায় ছিলেন মারাঠি তরুণ পিংলে। ঠিক হয় কাবুলে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। আর দিল্লী, কলকাতা, রেঙ্গুন হয়ে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত একযোগে অভ্যুত্থান ঘটবে ইংরাজের বিরুদ্ধে—১৯১৫ সালে ২১শে ফেব্রুআরি।

সব আশাই নির্মূল হল। শেষ হ'ল স্বাধীনতার স্বপ্ন। কৃপাল সিং নামে এক ঘৃণ্য জীব—সব কথা জানিয়ে দিলে ইংরেজ পুলিশকে।

ধরা পড়লো আমির চাঁদ, আনন্দবিহারী, বালমুকুন্দ কর্তার সিং। বীরের মত ফাঁসিমঞ্চে আত্মদান করলেন তাঁরা। মীরাটে সৈন্যব্যারাকে ধরা পড়লো পিংলে। তাঁর ফাঁসি হল। শুধু রাসবিহারী পুলিশকে ফাঁকি দিলেন।……বুঝলেন, ভারতবর্ষে আর তাঁর ঠাঁই হবে না, বিপ্লবের প্রায় সব ক্ষেত্র ভেঙে গেছে। সহকর্মীদের মধ্যে কেউ জেলে, কেউ বা ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছে। তাই ভারতের বাইরে থেকে অস্ত্র আর টাকা পাঠাতে হবে। ভরসা এখন বাঘাযতীন।

সেদিন ৬ নম্বর খিদিরপুর ডকে একটি জাপানী জাহাজ সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত। নাম 'সামুকি মারু'। যাবে সিঙ্গাপুর, হং কং হয়ে জাপান। বেলা ১২টা নাগাদ একটি ঘোড়ার গাড়ী এসে ৬নং ডকের ফটকে দাঁড়ালো।

সুঠাম চেহারার সাহেবি পোশাক পরা একটি যুবক গাড়ী থেকে নামলেন। সঙ্গে ধুতি পরা দুটি তরুণ যুবক। সঙ্গী দুজনকে বুকে চেপে আলিঙ্গন করলেন সাহেবটি। চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়তে লাগলো। তারপর দ্রুত জাহাজে উঠে গেলেন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী তিনি। নাম পি. এন. ঠাকুর। কবি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়। জাপান যাচ্ছেন পড়াশুনা করতে। জাপানী কাপ্টেন ইঞ্জিনিয়ার পার্শার খুব খাতির করছেন। এমন সময় এল এক ইংরাজ পুলিস অফিসার। কাপ্তেন জানালেন, ইনি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়, যাচ্ছেন জাপানের কোরে শহরে। পড়াশুনা

করবেন ওখানে। শুনে সাহেব সসম্ভ্রমে শেক হ্যাণ্ড করে বিদায় নিলেন। বলে দিতে হবে না বোধ হয়, ইনি রাসবিহারী—অভিনয়ে দক্ষ, ছদ্মবেশে পটু, আলাপে অদ্বিতীয়।

জাপানে আট বছর কেটেছে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তায়। ইংরাজ সরকার জাপানের উপর চাপ দিয়েছে রাসবিহারীকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য কিন্তু এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের যোদ্ধা স্বদেশহিতৈষী মিৎ-সুরু-তোয়ামা তাঁকে আশ্রয় দেন। জাপানী অভিজাত পরিবারের কন্যা তোষিকো সোমাকে বিবাহ করে জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন রাসবিহারী। গড়ে তোলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ। বিদেশে বসে ভারতের কথা ভোলেন নি। অসহ দারিদ্র্যের মধ্যেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা চিন্তা করতেন। ভূমিকম্পে তাঁর ঘর ভেঙে গেছে, নিরাশ্রয় হয়ে সাহায্য চেয়েছেন দেশবাসীর কাছে। সাহায্য আসেনি। শুধু রবীন্দ্রনাথ ৬২৫ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। কবি বড় স্নেহ করতেন এই সর্বস্বত্যাগী মহাবিপ্লবীকে।

চব্বিশ বছর কেটে গেছে। রাসবিহারীর পাথরের মত দেহ দুশ্চিন্তায় জীর্ণ হয়েছে। এমনি সময় বাধলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জাপানের কাছে হার মেনে হাজার সৈন্য ফেলে ইংরাজ পিছু হটে গেল। সেই সৈন্যদল নিয়ে রাসবিহারী গড়ে তুললেন আজাদ হিন্দ বাহিনী।

ইতিমধ্যে তাঁর একমাত্র ছেলে মাশাহিদে মাত্র ২৪ বছর বয়সে যুদ্ধে মারা গেলেন। রাসবিহারীর স্ত্রী অনেক আগেই দেহ রেখেছিলেন; এবার গেলেন পুত্র। পুরুষসিংহ রাসবিহারী বুঝতে পারলেন এবার তাঁর শেষের দিন সমাগত। তাই আহ্বান জানালেন আর এক মহা স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রকে। তিনি তখন ইংরাজের শ্যেনচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে ভারত থেকে জার্মানীতে উপস্থিত হয়েছেন। সাবমেরিনে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সুভাষচন্দ্র এলেন জাপান। তাঁর হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভার তুলে দিলেন রাসবিহারী।

যেদিন খবর পেলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষের মাটি দখল করেছে সেদিন তাঁর কি আনন্দ! কিন্তু বছর খানেক বাদে মাত্র ৫৯ বছর বয়সে এই মহাসংগ্রামী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হন।

['যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।' —নজরুল]

একটি তেজী ছেলের কাহিনী

কলকাতায় তখন সবে বিদ্যুৎ চালিত ট্রাম চলছে। আগে ঘোড়ায় টানতো ট্রাম। তা বোধ হয় তোমরা জানো। মেডিকেল কলেজের সামনে এসে একটা ট্রাম ঘণ্টা বাজাচ্ছে, গতিও দিয়েছে কমিয়ে। কারণ চারটে বেজেছে, লোক আসছে অসুস্থ আত্মীয় স্বজনকে দেখতে। ঠিক এমনি সময় একটা ঘোড়ার গাড়ী কলেজ গেট থেকে বেরিয়ে গিয়ে পড়লো একেবারে ট্রামের সামনে। দোষটা কোচম্যানের, সে বেসামাল না হলে ট্রামের মুখে পড়তো না। ফলে যা হবার তাই হল। ঘোড়ার গাড়িটা ভেঙে চুরমার, ঘোড়াও জখম হল। ভাগ্য ভাল, আরোহী সামান্য আহত হলেও প্রাণে বাঁচলেন। আরোহী ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের এক অধ্যাপক কর্ণেল পেক। প্যাণ্টের ধুলো ঝেড়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে চোখে পড়লো সামনেই এক চেনা মুখ—তাঁর কলেজেরই ছেলে। ডেকে বললেন, ওহে, তুমি সব ব্যাপারটা তো দেখলে। দুর্ঘটনাটা ঘটেছে ট্রামচালকের দোষে। এত জোরে ট্রাম চালাচ্ছিল বলেই না আমার কোচোয়ান গাড়ি সামলাতে পারেনি। আমি ক্ষতি-পূরণ দাবী করে কেস করবো ট্রাম কোম্পানীর বিরুদ্ধে। তুমি সাক্ষ্য দেবে তো?

ছেলেটি সবিনয়ে বললে,—দেব, তবে সত্য কথা বলবো।

সাহেব অবাক হয়ে বললেন,—শুনি তোমার সত্য কথা।

ছেলেটি বললে,—আপনার কোচোয়ানের দোষেই দুর্ঘটনা ঘটেছে, ট্রামতো বেশ আস্তেই আসছিল।

পেক সাহেব ছেলেটির কথা শুনে রেগে টঙ্। আচ্ছা তোমায় দেখে নেব, মনে রেখ সামনেই পরীক্ষা।

ছেলেটি পড়লো বিপদে। মেডিক্যাল কলেজের ভাল ছেলে। এবার ফাইনাল এম. বি. দেবে। সবাই জানে, এই ছেলেটিই ফার্স্ট হবে। লিখিত পরীক্ষা খুবই ভাল হল। এবার ভাইবা ভোসি (Viva Voce) অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষা। হবি তো হ, সেই পরীক্ষায় পরীক্ষক হলেন কর্ণেল পেক।

পরীক্ষার দিন ছেলেটি বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়েই কলেজে এল। ভরসা আছে কর্ণেল পেক যতই কঠিন প্রশ্ন করুক না কেন, সে নির্ভুল জবাব দেবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড। ঘরে ঢুকতেই পেক সাহেব 'গেট আউট' 'গেট আউট' বলে ছেলেটিকে পরীক্ষার হল থেকে বার করে দিলেন। কোন প্রশ্নই করলেন না। দেশ তখন পরাধীন। সাহেবদেরই রাজত্ব —কোন বিচারই হল না। ছেলেটিকে ফেল করানো হল।

মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন লিউকিস সাহেব। তিনিও ইংরেজ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বড় ইংরেজ' —সত্যিকার সহৃদয় মানুষ। ছাত্রবন্ধু তিনি। ফেল করে ছাত্রটির মন ভেঙে গেল। নিরুপায় হয়ে দেখা করলো লিউকিস সাহেবের সঙ্গে। সাহেব মন দিয়ে সব কথা শুনলেন ছেলেটির। বড় বংশের ছেলে—বারোভুঁইয়া শ্রেষ্ঠ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। বাবা প্রকাশচন্দ্র রায়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন অবসর নিয়েছেন। ব্রাহ্ম সমাজের কাজে বহু টাকা খরচ করছেন। বড় দুই ছেলেকে বিলাতে পড়াতে সব সঞ্চয় শেষ। ছোট ছেলেকে তাই টিউশনী করে পড়ার খরচ চালাতে হয়েছে। আশা ছিল ডাক্তার হয়ে সংসারে সাহায্য করবে। তা বুঝি আর হবে না। কর্ণেল লিউকিস ছেলেটির জন্য সত্যই বেদনা বোধ করলেন। বিশেষ করে সাধারণ বাঙালীর তুলনায় দীর্ঘদেহী উজ্জ্বল মুখ এই তরুণটিকে তাঁর ভাল লেগেছিল। বললেন,—তুমি এক কাজ কর, দিন সাতেক পরেই এল. এম. এস. পরীক্ষায় বসে যাও। ছেলেটি কিন্তু ইতস্ততঃ করে, রাজী হতে চায় না। কারণ সে পরীক্ষাতেও যে মৌখিক পরীক্ষা নেবেন কর্ণেল পেক। শেষ অবধি মুখ ফুটে বলেও ফেললে কথাটা।

লিউকিস সাহেব হেসে বললেন, সে ভাবনা আমার। এল. এম. এস. পরীক্ষা দিল ছেলেটি। মৌখিক পরীক্ষার দিন কর্ণেল পেক কিন্তু ভারি মধুর ব্যবহার করলেন। বললেন,—তাইতো, বড্ড ক্ষতি হয়ে গেল

তোমার। বোঝা গেল—তাঁর এই ব্যবহার বদলের পিছনে আছে লিউকিস সাহেবের হাত। আচ্ছা করে ধমকে দিয়েছিলেন পেককে। এল. এম. এস পরীক্ষা পাস করে ছেলেটি—না, এখন তিনি রীতিমত তরুণ চিকিৎসক, চাকরী নিলেন বাংলা সরকারের মেডিক্যাল সার্ভিসে। মাইনে মাত্র নিরানব্বই টাকা দশ আনা। বছর তুয়েকের হাড় ভাঙা পরিশ্রমে এম. ডি. ডিগ্রী পেলেন। এর পরের ইতিহাস একটানা জয়ের। তবে সে জয় সহজে আসেনি। সাহেব ডাক্তাররা বার বার তাঁকে অপদস্থ, অপমান করার চেষ্টা করেছেন। একবার হল কি, একটি রোগী পরীক্ষা বেড টিকিটে ওষুধের নির্দেশ লিখে দিয়েছেন, ক্যাপ্টেন আর. উইন নামে এক ডাক্তার এসে তা দিলেন পাল্টে। রোগীর এতে মৃত্যু হতে পারে। তখনি তিনি লিউকিসের কাছে ছুটে গেলেন। লিউকিসের আদেশে আবার নির্দেশ বহাল রইল। ফলে ক্যাপ্টেন আরউইন ছেলেটির শত্রু হয়ে রইলেন। আর একবার হাসপাতালের ডাক্তার কর্ণেল বার্ডকে সেলাম না করায় তিনি তো রেগে লাল। এত বড় স্পর্ধা একজন কালা আদমীর। কিন্তু তিনি কিছুতেই বার্ডকে মাথা নীচু করে সেলাম করেননি।

তরুণ চিকিৎসকটি দেখলেন, বিলাতী ডিগ্রী না থাকলে এসব সাহেব ডাক্তার সম্মান করে না। তাই ঠিক করলেন, তিনিও বিলাত যাবেন। শুধু এফ. আর. সি. এস. নয়, এম. আর. সি. পি.-ও হয়ে ফিরবেন। যে কথা সেই কাজ। জাহাজে যখন উঠলেন, তাঁর পকেটে তখন মাত্র বার শত টাকা। বিপদ ঘটলো বিলাতে। সেন্ট বার্থলোমিও কলেজের ডীন ডাঃ শেরি বিশ্বাস করতে চাইলেন না—একই সঙ্গে কঠিন তু তুটো পরীক্ষা একজন ভারতীয় "কালা নেটিভ" পাস করতে পারবে। হাতে মাত্র তু বছর তিন মাস সময়। ভর্তি করতে চাইলেন না। এক মাস হাঁটাহাঁটির পর শেষ অবধি জেদের জয় হল। যুবকটি ভর্তি হলেন। তাঁর দিকে প্রথম থেকেই শিক্ষকদের দৃষ্টি পড়লো। এমনভাবে যুবকটি শব ব্যবচ্ছেদ করলেন—সোজা কথায় মড়া কেটে দেহের ভিতরের ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র, যকৃত প্রভৃতি নিপুণভাবে বার করে দেখালেন যে শিক্ষক চমৎকৃত হলেন। এরপর তাঁকে আর মাইনে দিয়ে পড়তে হয়নি। কলেজেই ডিমনস্ট্রেটরের কাজ পেয়ে গেলেন। তাতে কিছু মাইনেও পেতেন।

এম. আর. সি. পি. পরীক্ষায় অসাধারণ ফল করলেন—হলেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। এফ. আর. সি. এস. এ প্রথম না হলেও পেলেন প্রথম শ্রেণী।

চাঁদপাল ঘাটে যখন জাহাজ থেকে নামলেন পকেটে গোটা তিনেক টাকা মাত্র। বিলাতে প্রতিদিন কত খরচ করবেন, তা আগে থেকেই হিসাব রেখেছিলেন, সে হিসাবে গরমিল হয়নি।

এই তরুণ চিকিৎসকটির পরিচয় তোমরা বুঝতে পেরেছো বোধ হয়। ইনি ভারত বিখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। কলকাতার মেয়র হয়েছেন, হয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। শেষে ছেষট্টি বছর বয়সে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা, কল্যাণী উপনগরী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি কত কীর্তিই না তাঁর। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বিরাট বাড়িটাও দেশের গরীব মানুষদের জন্য দান করে গেছেন। সেখানে গড়ে উঠেছে একটা পলিক্লিনিক—তাঁর বাবা-মায়ের নামে।

["হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর
হও উন্নত শির-নাহি ভয়।" —অতুলপ্রসাদ]

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিজয় করে আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। আছেন বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীতে। একটি বছর আঠারো বয়সের তাজা তরুণ প্রণাম করলে তাঁকে। স্বামীজী তার মুখে দেখলেন ত্যাগ আর বৈরাগ্যের দীপ্তি। চোখে সাহস ও বীরত্বের আলো। ছেলেটির চওড়া কাঁধের উপর হাত রেখে স্বামীজী বললেন "মনে রেখ মায়ের জন্য তুমি বলি প্রদত্ত। অন্য কোন দেবদেবীর প্রয়োজন নেই, দেশমাতাই তোমার আরাধ্য হোক।"

ছেলেটির নাম যতীন্দ্রনাথ। পদবী মুখোপাধ্যায়। নদীয়া জেলার কয়া গ্রামে তার জন্ম ১৮৭৯ সালে। বাবার নাম উমেশচন্দ্র। মায়ের নাম শরৎশশী।

ছেলেবেলা থেকেই ভারি দুরন্ত যতীন্দ্রনাথ। বর্ষায় গড়াই নদী সাঁতার কেটে পার হন। ঘোড়ার ঝুঁটি ধরে লাফিয়ে পিঠে চড়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেন। কিন্তু প্রাণটা বড় কোমল। বুড়ী কৃষাণী ঘাসের বোঝা নিয়ে রোদে চলতে পারছে না—তার বোঝা মাথায় নিয়ে তার কুঁড়েতে পৌঁছেছেন। গ্রামে কারো কলেরা হয়েছে—ছুটে যান সেই ভয়ানক রোগে সেবা করতে। দুহাতে তার বমি আর মল সাফ্ করেন।

একদিন হল কি—গ্রামের কাছেই জঙ্গলে এল বাঘ। আজ এর বাছুর মারে, কাল ছাগল, শেষে একজন গরীব চাষীকেও বাঘে নিলে। ষোল বছরের তরুণ যতীন্দ্রনাথ হাতে একটা ভোজালী নিয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন। বাঘকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর উপর। শুরু হল লড়াই। ভোজালীর ঘায়ে বাঘ মরলো বটে। তবে তার দাঁত আর নখের আঁচড়ে যতীন্দ্রনাথের দেহ হল ফালা ফালা। বিষিয়ে গেল

শরীর। তাঁকে বাঁচাবার জন্য শরীরে এক অস্ত্রোপচারের দরকার হল। সেকালের বিখ্যাত সার্জন ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী ছুরি হাতে প্রস্তুত হলেন। এবার ক্লোরোফর্ম দিয়ে যতীন্দ্রনাথকে অজ্ঞান করা হবে। যতীন্দ্রনাথ বললেন—দরকার নেই ক্লোরোফর্মের ডাক্তারবাবু, আপনি ছুরি চালান। ডাক্তার ক্ষতে ছুরি বসালেন—রোগীর মুখ থেকে এতটুক কাতরোক্তি শোনা গেল না।

যতীন্দ্রনাথের সহ্যশক্তি দেখে ড়াঃ সর্বাধিকারী অবাক হলেন। ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় এমন ব্যাপার তিনি দেখেন নি। সংবাদপত্রে চিঠি লিখে ঘটনাটা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এরপর থেকে যতীন্দ্রনাথের নাম হয়ে যায়—"বাঘাযতীন।"

যতীন্দ্রনাথের মনে সুখ নেই। স্কুলে ইতিহাস পড়েন। জানেন ইংরাজ দেশের রাজা। ভাবেন আমরা কি চিরকাল পরাধীন থাকবো? সইবো—অপমান আর নির্যাতন? একদিন ঘটলো একটা ব্যাপার। ট্রেনে যাচ্ছেন, অসুস্থ আত্মীয় রয়েছে সঙ্গে। জল খেতে চাইলেন আত্মীয়টি। যতীন্দ্রনাথ কাচের গেলাসে করে জল আনছেন। কটা গোরা সৈন্য মজা করে হাতের ছড়ি দিয়ে যতীন্দ্রনাথের হাতে আঘাত করে। হাত থেকে গেলাসটা পড়ে ভেঙে যায়। অশিক্ষিত বর্বর গোরাগুলো দাঁত বার করে হাসে। সহসা সেই দাঁতের উপর যতীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড ঘুষি এসে পড়ে। দাঁত ভেঙে যায়।

দেশকে স্বাধীন করতে হবে। কিন্তু কোথায় পথ। স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়েন। মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চার হয়।

ইতিমধ্যে স্কুলের পড়া শেষ করেছেন। পাশ করেছেন প্রবেশিকা পরীক্ষা। বিবাহ হয়েছে। বিরাট সংসারের দায় ঘাড়ে। তবু জীবনের লক্ষ্য ভোলেন না। মনে মনে জপ করেন স্বামীজীর বাণী—তুমি মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। পুত্রশোকে কাতর হয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। হরিদ্বারে দেখা হয় ভোলানন্দ গিরির সঙ্গে। তাঁরই নির্দেশে ফিরে আসেন গৃহে। এ সময় অরবিন্দ ঘোষ উচ্চ বেতনের চাকরী ছেড়ে এসেছেন কলকাতায়। গড়ে উঠেছে অনু শীলন, আত্মোন্নতি, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি। সরকারী চাকরী করলেও গোপনে যোগাযোগ রাখেন অনুশীলন দলের কর্তা ও ব্যারিস্টার পি. মিত্রের সঙ্গে। অরবিন্দের সঙ্গে

আলাপ হয়। ভগিনী নিবেদিতার স্নেহ তিনি পান। তাঁর উৎসাহে উদ্দীপিত হন।

এমনি সময় ঘটলো বঙ্গভঙ্গ। বাঙালী জাতি যেন বহু শতাব্দীর ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে খোলা হল ব্যায়ামাগার। কুস্তি লাঠি ছোরা আর তলোয়ার খেলা শেখানো শুরু হল। আর এই কুস্তির আখড়ার আড়ালে বিপ্লবী দল এসে কাজ করতো। সংগ্রহ করতো সেরা ছেলেদের। যারা ভোগ সুখ চায় না। দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

কলকাতার বিপ্লবীদের আস্তানাতেই যতীন্দ্রনাথের আলাপ হয়েছিল,— বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নিরালম্ব স্বামী নাম নিয়ে যিনি উত্তর ভারতে বিপ্লবের বাণী প্রচার করেছিলেন। রাসবিহারী বসু, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়) বিপিন গাঙ্গুলি, যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ মহবিপ্লবীদের সঙ্গে হয়েছিল অন্তরঙ্গ পরিচয়।

এমন সময় একটা ঘটনায় সারা ভারত আলোড়িত হল। অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেটকে বোমা মারলো মেদিনীপুরের বীর বালক ক্ষুদিরাম। অরবিন্দের বিপ্লবীদলের ছেলে ক্ষুদিরাম। ইংরেজ পুলিশ সারাদেশ জুড়ে জাল ফেলে বিপ্লবী ছেলেদের জেলে ভরলে। নেতাদের আন্দামানে করলে নির্বাসিত।

অরবিন্দ ছাড়া পেলেন। চলে গেলেন পণ্ডিচেরী। যাবার আগে যতীন্দ্রনাথকে ডেকেছিলেন। ঠিক কি বলেছিলেন তা আজ আর জানা যায় না। তবে বাংলার বিপ্লবের দায় পড়লো যতীন্দ্রনাথের উপর। কারণ তার যোগ্যতা তখন প্রমাণিত, কারণ বিপ্লবীদের ফাঁসিতে ঝোলাবার ব্যবস্থা যে করছিল —সেই কুখ্যাত পুলিশ অফিসার সামশূল আলমকে গুলি করে মারে বীরেন দত্তগুপ্ত। সরকারী উকিল আশু বিশ্বাসের নিধনকারী চারু বোস। যতীন্দ্রনাথের হাতেগড়া কর্মী।

পুলিস এতদিন ধারণাই করতে পারে নি—। সরকারী কর্মচারী যতীন্দ্রনাথ বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত।
বীরেন দত্তগুপ্ত নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে যতীন্দ্রনাথের নামটি বলে

দেয়। পরে তার ভুলের জন্য বীরেন অনুতাপ করে। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। যতীন্দ্রনাথের চাকরী যায়। তিনি ঠিকাদারীর কাজ শুরু করেন। সারা বাংলার বিপ্লবীদলগুলি যতীন্দ্রনাথকে নেতা বলে মেনে নেয়। সবার তিনি ছিলেন দাদা। কে বলবে এই স্নেহশীল মানুষটি এক বিশাল বৈপ্লবিক পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত। এদিকে উত্তর ভারতে রাসবিহারী বিপ্লবের বীজ বুনে চলেছেন। মাথার উপর তাঁর ফাঁসির দড়ি ঝুলছে।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ১৯১৪ সালের অগস্ট মাসে। বিপ্লবীরা দেখলেন এই সুযোগ। জার্মানী থেকে গোপনে দূত এল যতীন্দ্রনাথের কাছে। ও দেশে ভারতীয় বিপ্লবীরা তৈরী করছেন ভারত-বার্লিন সমিতি। তারা জার্মান-রাজ কাইজারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। কাইজার অস্ত্র দেবেন। সেই অস্ত্র জাহাজে করে আসবে ভারতবর্ষে।

এদিকে বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলির দলের সহায়তায় ৫০টি শক্তিশালী মসার রাইফেল যতীন্দ্রনাথের হাতে এসে গেছে। এদিকে রাসবিহারী খবর পাঠিয়েছেন—দিল্লী-কানপুর থেকে—কলকাতা, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর সৈন্যরা একযোগে বিদ্রোহ করবে।

দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য ভূমিতে রামকৃষ্ণের সাধনপীঠ পঞ্চবটি তলায় গভীর রাত্রে এক গোপন অধিবেশন হল। সে সভায় ছিলেন মহাবিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ, রাসবিহারী, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় আর যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

প্রস্তাব হয় ফোর্ট উইলিয়াম দখলের। রাসবিহারী সে দায় নেন। স্থির হয় অস্ত্র এসে পড়লে বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলি আর নরেন্দ্রনাথ ফোর্ট দখল করবেন।

এমন সময় ঘটে গেল একটা দুর্ঘটনা। যতীন্দ্রনাথ তখন পাথুরিয়াঘাটার এক বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিলেন। কেমন করে খবর পেয়ে গুপ্তচর নীরদ হালদার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যেই বলেছে—এই যে যতীনবাবু এখানে।

সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পার্শ্বরক্ষী অমিত সাহসী চিত্তপ্রিয় তাকে গুলি করে। মরার আগে সে কিন্তু বলে—যতীন্দ্রনাথ গুলি করেছেন। ফলে পুলিস যতীন্দ্রনাথের নামে মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে।

এদিকে জাহাজে করে অস্ত্র আনতে নরেন্দ্রনাথ সি. মার্টিন ছদ্মনামে বাটাভিয়া চলে যান। ঠিক হয় উড়িষ্যার বালেশ্বরের সমুদ্রের ধারে জাহাজ

ভিড়বে। যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে কাপ্তি পোদার মহুলডিহা গ্রামে আত্ম-গোপন করেন।

কিন্তু অস্ত্র আসেনি। বৃথাই যতীন্দ্রনাথ প্রতীক্ষা করে রইলেন। জার্মান-অস্ত্র বোঝাই "সে ডারিক" জাহাজ ধরা পড়ে যায়।
কলকাতা থেকে সৈন্য আর পুলিশ বাহিনী নিয়ে এল কুখ্যাত টেগার্ট সাহেব।

বুড়ী বালাম নদীর তীরে শুরু হ'ল এক বিচিত্র সংগ্রাম। একদিকে হাজার দুয়েক সৈন্য, হাতে তাদের রাইফেল আর কামান। আর এক-দিকে যতীন্দ্রনাথ, সঙ্গে চারটি তরুণ যুবক—চিত্তপ্রিয়, নীরেন, যতীশ আর মনোরঞ্জন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন স্বাধীনতা সংগ্রাম আর ঘটেনি। মসার পিস্তল নিয়ে যতীন্দ্রনাথ লড়লেন। শেষে গুলি গেল ফুরিয়ে। যতীন্দ্রনাথের দেহ বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তাঁকে একটু জল দেবার জন্য চিত্তপ্রিয় উঠে দাঁড়িয়েছেন—বুকে এসে বিঁধল গুলি। শেষশয্যা নিলেন মহাবীর।

হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে যতীন্দ্রনাথ বললেন—জানি দু' একটা বোমা পিস্তল নিয়ে দেশের স্বাধীনতা আসে না—আমরা ভয় ভাঙিয়ে গেলাম।

["বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার
ধূলায় হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?" —রবীন্দ্রনাথ]

বন্দেমাতরমের ঋষি

১৯০১ সাল। ঢাকায় গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে একটি তরুণ তাঁর সঙ্গে দেখা করলো। স্বামীজীকে প্রণাম করে ছেলেটি বললে—'আমরা কি চিরকাল পরাধীন হয়ে থাকবো? স্বাধীন হবার পথ বলে দিন।' স্বামীজী ছেলেটির কাঁধে হাত দিয়ে বললেন—'আনন্দমঠ পড়, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ। পথ খুঁজে পাবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পুরা নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২৪ পরগণার কাঁঠাল-পাড়ায় জন্ম। পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন সেই প্রথম আমলের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মেদিনীপুরে তখন তাঁর কর্মক্ষেত্র। তাই মেদিনীপুরেই বঙ্কিমচন্দ্রের পড়াশুনা আরম্ভ হল সরকারী বিদ্যালয়ে। অসাধারণ বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রথম বছরের পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়েই প্রায় পুরো নম্বর পেলেন। সাহেব হেডমাস্টার মিঃ টিড তাকে 'ডবল প্রমোশন' দিতে চাইলেন। কিন্তু যাদবচন্দ্র রাজি হলেন না। সে আমলে জুনিয়র স্কলারশিপ ও সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা ছিল। দুটি পরীক্ষাতেই ফার্স্ট হয়ে স্কলারশিপ পেলেন বঙ্কিমচন্দ্র। অবশ্য সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষাটা হুগলী কলেজে পড়ে দিয়েছিলেন। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়তে। এই সময়ে ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এনট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন, ভালভাবে পাসও করলেন। পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। মাত্র দুজন বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। প্রথম হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় স্থান পেলেন যদুনাথ বসু।

এমন সময় সরকারী দপ্তর থেকে চিঠি এল—তিনি কি ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী করতে চান? চাকরী করার আগ্রহ বঙ্কিমচন্দ্রের কোনদিন ছিল না। তবু বাবার কথায় রাজি হতে হল। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে চাকরী নিয়ে এলেন যশোরে। এখানে তখন প্রখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র কর্মরত ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' দুজনেই কবিতা লিখতেন। সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, এবার আলাপ হল। এঁদের বন্ধুত্ব বজায় ছিল আমৃত্যু।

বঙ্কিমচন্দ্র যশোর থেকে এলেন মেদিনীপুরের নেগুয়ায়। নেগুয়া থেকে খুলনায় বদলী হয়ে এলেন। খুলনায় তখন নীলকর সাহেবদের নিদারুণ অত্যাচার চলছে। মরেল নামে এক নীলকর সাহেব দাঙ্গাবাজ। জোর করে চাষের জমিতে নীল বুনতে বাধ্য করে। যারা আপত্তি করে, ধরে এনে চাবুক মারে। চুনের ঘরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে। তার পাইক, বরকন্দাজ আছে। লাঠিয়াল পোষে। বন্দুক, সড়কির জোরে জমি দখল করে।

একদিন খবর এল মরেল সাহেব বড়থালি গ্রামে লাঠিয়াল নিয়ে ঢুকে দাঙ্গা বাধিয়েছে। চাষীদের গোলপাতার ঘরে আগুন লাগিয়েছে। খুন, জখম করেছে আর মেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে। শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের তরুণ রক্ত উঠলো তপ্ত হয়ে। ঘোড়ায় চড়ে, হাতে পিস্তল নিয়ে উপস্থিত হলেন—বড়থালি গাঁয়ে। মরেল প্রথমটা রুখে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে সড়কি দিয়ে গেঁথে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে মরেলের লাঠিয়ালদের ভয় পাইয়ে দেন। মরেলকে বেঁধে ফেলা হয়। তখন মরেল এক লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে চায় বঙ্কিমচন্দ্রকে। বঙ্কিমচন্দ্র লোকটার স্পর্ধা দেখে অবাক হন। চালান করে দেন সদরে। এরপর থেকে সে অঞ্চলে নীলকরদের জুলুম চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

দক্ষ ডেপুটিরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের যশ বেড়ে ওঠে, মাহিনার বৃদ্ধি ঘটে। তাঁকে বদলী করে আনা হয় ২৪ পরগণার বারুইপুরে। বারুইপুর তখন মহকুমা। বারুইপুরে বসে শেষ করলেন 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস রচনা। কবিতা রচনার অভ্যাস অল্পবয়স থেকেই ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকর' পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছে। ইংরাজীতে একটা উপন্যাসও লিখেছিলেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের মতই বুঝতে পারলেন—মাতৃভাষা বাংলায় না লিখলে কেউ তা আদর করবে না। তাই ঠিক করলেন,

বাংলা ভাষাতেই লিখবেন। বিদ্যাসাগর মশাই বাংলা গদ্যের জনক। কিন্তু সে ভাষায় কোন ভাল উপন্যাস লেখা হয়নি। খুলনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা শুরু করেন। বারুইপুরে এসে লেখা শেষ করেন। দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পড়তে দিয়েছিলেন দুজন সংস্কৃত পণ্ডিত আর নিজের দুই দাদাকে। তাঁরা বললেন—এ বই চলবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস। তাই বই ছাপালেন। বইটা পড়ে বাঙালী পাঠক মুগ্ধ হল। একে একে প্রকাশিত হল 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী'। দেখতে দেখতে বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি ও যশ বেড়ে উঠলো। বোঝা গেল এক মহাপ্রতিভাধর ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব হয়েছে। প্রশংসার সঙ্গে নিন্দাও এল। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—তাঁর পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে 'গুরু চণ্ডালী' দোষ দেখলেন। গুরুচণ্ডালী দোষ হল—সাধু ভাষার পাশাপাশি দেশী চলতি শব্দের প্রয়োগ। তাঁর দলের লোকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষীয়দের 'শব পোড়া, মড়া দাহের দল' বলে বিদ্রূপ করতে লাগলো। আর বঙ্কিমচন্দ্রের দল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ভাষাকে "ভট্টাচার্যের দাঁত ভাঙা চানা" বলে পরিহাস করতো।

যুগটা ছিল ইংরাজ ভক্তির। তবে ইতর প্রকৃতি ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যবহারে সে ভক্তির স্রোতে তখন ভাঁটা শুরু হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল একটা ঘটনায়। ঘটনাটা ঘটেছিল বারুই-পুরেই। একদিন এক ছোকরা ইংরাজ বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে ঢুকে তাঁকে বঙ্কিম, বঙ্কিম বলে ধমকাতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—সাহেব তুমি যদি ক্ষমা না চাও তবে তোমায় হাতকড়ি পরিয়ে চালান দেব। সাহেব তো বঙ্কিমচন্দ্রের রুদ্রমূর্তি দেখে ক্ষমা চেয়ে পালিয়ে বাঁচে।

পরের ঘটনাটা ঘটেছিল বহরমপুরে। 'বঙ্গদর্শন' নামে পত্রিকা প্রকাশ করছেন। তাতে প্রকাশিত হয়েছে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি উপন্যাস। সারাদেশ ব্যাকুল হয়ে থাকে কবে বেরুবে 'বঙ্গদর্শন'। বঙ্কিমচন্দ্র তখন একজন দেশমান্য মানুষ। এমন সময় একদিন পাল্কি করে বঙ্কিমচন্দ্র কর্মস্থলে যাচ্ছেন। কর্ণেল ডফিন নামে এক উগ্র প্রকৃতির বর্বর সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে জোর করে পাল্কি থেকে নামিয়ে দেয়। বলে —নেটিভদের পাল্কি চড়ে যাওয়া সে পছন্দ করে না। মূর্খ লোকটা জানতো না কার সঙ্গে সে লাগতে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র লাট সাহেবের

কাছে ব্যাপারটা লিখে জানান। পত্র-পত্রিকাতেও এ নিয়ে আন্দোলন হয়। ফলে ডফিনকে ক্ষমা চাইতে হয়। লোকটা জব্দ হয়ে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন, জাতির জাগরণ ছাড়া দেশের মুক্তি নেই। তাই বঙ্গদর্শনে—দেশের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। শোষিত কৃষকদের কথা চোখের সামনে তুলে ধরেন। দরিদ্র চাষী রামা কৈবর্ত ও হাসিম শেখই যে দেশ। লেখেন—এদের উন্নতি ছাড়া যে দেশের উন্নতি নেই। 'বিড়াল' নামে রস রচনা লিখে একশ বছরের আগে মানুষে মানুষে সমান অধিকারের কথা প্রচার করেন। দেশের মানুষের মনে স্বাধীনতার চেতনা জাগাবার জন্য লেখেন—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ইংরাজ শাসকরা প্রথমদিকে এই উচ্চশিক্ষিত তরুণ রাজকর্মচারীটির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে তারা বুঝলো ইনি সামান্য নন—ইনি স্বাধীনতা চেতা—কাউকে তোয়াজ বা খোসামোদ করতে প্রস্তুত নন, সেদিন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র হলেন তাঁদের কাছে সন্দেহভাজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে কম বিদ্যা ও যোগ্যতার লোককে উচ্চপদে প্রমোশন দিয়েছে, কিন্তু তাঁকে দেয়নি। বিশেষ করে যেদিন প্রকাশিত হল 'আনন্দ মঠ"—সেদিন সারাদেশে বয়ে গেল এক নতুন প্রাণের জোয়ার। সন্ন্যাসী ভবানন্দের কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্', 'সুজলাং সুফলাং' মহাসংগীত শুনে জাতি মোহিত হল। রবীন্দ্রনাথ ১৯৮৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে নিজে সুর দিয়ে গেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মনীষীরা সকলেই ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার শ্রদ্ধালু পাঠক। তা দেশের যারা মুক্তি চায় তাদের পথের দিশা আছে আনন্দমঠে—এই ছিল এঁদের অভিমত। তাই বিবেকানন্দ বিপ্লবী তরুণ হেমচন্দ্রকে বলেছিলেন—আনন্দমঠ পড়, তাতেই পাবে তোমাদের পথনির্দেশ।

তাই ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের দশ বছরের মধ্যে বন্দেমাতরম্ মহাসংগীত সারা ভারতের জাতীয় সংগীত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা সংগ্রামী মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণেরা "বন্দেমাতরম্" বলে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিতে ভীত হয়নি।

["যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
স্বষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।"—রবীন্দ্রনাথ]

বাঙালী কর্মবীর

আলীপুর চিড়িয়াখানার বাঘ, সিংহ, বানর, পাখী রাখার ঘর তৈরী হচ্ছে। এক সাহেব রাজমিস্ত্রিদের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সাহেবের কথা মিস্ত্রিরা বুঝতে পারছে না। কারণ সাহেব কথা বলছেন ইংরাজীতে আর ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে। মিস্ত্রিরা সবাই এদেশী বাঙালী। ইংরেজী হিন্দী কোনটাই বোঝে না। কিছুদূরে দাঁড়িয়েছিল ১৯।২০ বছরের এক যুবক। সে এগিয়ে এল। সাহেবকে বললে—আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি মিস্ত্রিদের বুঝিয়ে দিতে পারি আপনি কি বলছেন। সাহেব মনে মনে রাগলেন, একটা ধুতিপরা "কালা আদমীর" স্পর্ধা দেখে। তবে গরজ বড় দায়, বললেন—এসব এঞ্জিনীয়ারিং-এর ব্যাপার। বোঝ তুমি "ডিজাইন" কাকে বলে? বলে নীল রঙে ছাপা ব্লু প্রিণ্টটা বাড়িয়ে ধরলেন। "সামান্য বুঝি" বলে ব্লু প্রিণ্টটা নিলেন যুবকটি। ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। একটা নালার উপর সেতু তৈরী করতে হবে। জলের ভিতর থেকে পিলার গেঁথে তুলতে হবে। যুবক মিস্ত্রিদের সহজেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে। কাজ আরম্ভ করলো। সাহেব তো অবাক। গুণগ্রাহী ছিলেন তিনি। বুঝলেন—এ যুবক সাধারণ নন। বললেন—, তোমার নাম কি? কি কর? এখানেই বা কেন এসেছ?

যুবকটি নাম বললেন—রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বেকার, কাজের সন্ধানে আছি। এখানকার পশুশালার অধ্যক্ষ আমার পরিচিত, তাঁর কাছেই এসেছি। সাহেব বললেন—কতদূর পড়াশুনা করেছ?

রাজেন্দ্রনাথ জানালেন বছর তিনেক ইঞ্জিনীয়ারিং পড়েছি। কিন্তু অর্থাভাবে পড়া শেষ করতে পারিনি। ডিগ্রী নেওয়া হয়নি।
সামান্য মাইনের চাকরী পেয়েছিলাম —নিইনি। ইচ্ছা আছে

স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করি। অথচ বাড়ীতে মা আছেন। বিবাহ করেছি, স্ত্রীর দায় ঘাড়ে পড়েছে। এদের ভরণ পোষণের দায় আমার উপর।

সাহেব দেখলেন, ছেলেটি সরল উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ভারি সন্তুষ্ট হলেন তার উপর। রাজেন্দ্রনাথের হাতে একখানা কার্ড দিয়ে বললেন, পলতায় দেখা করো।

কার্ডের দিকে চেয়ে রাজেন্দ্রনাথ অবাক। আর সাহেব তো যে সে লোক নন। কলকাতা পৌর সভার প্রধান ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ব্রাডফোর্ড লেনলী। সারারাত উত্তেজনায় ভাল করে ঘুমোতে পারলেন না রাজেন্দ্রনাথ। পরদিন কোট প্যাণ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পলতায় লেসলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। সাহেব রাজেন্দ্রনাথের ছিমছাম্ পোষাক আর আর সপ্রতিভ কথায় আবরণে প্রীত হলেন।

তখন পলতায় গঙ্গার জল শোধণ করে করে বড় বড় ট্যাঙ্ক তৈরীর কাজ চলছিল। এই সব কাজের ভার প্রাপ্ত প্রধান কর্তা ছিলেন লেসলী। লেসলী সাহেব, জল শোধন করা, থিতান, ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা জটিল প্রশ্ন করলেন রাজেন্দ্রনাথকে। রাজেন্দ্রনাথ প্রতিটি প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দিলেন। সাহেব চমৎকৃত। সন্তুষ্টও হলেন। বললেন—মুখার্জী এখানকার কাজ তো তুমি দেখলে। ঠিকাদারীর রেটও তোমায় বললাম। কাজ দিলে পারবে?

রাজেন্দ্র দেখলেন, ভেবে উত্তর দেবার সময় নেই, কারণ এ সুযোগ জীবনে দুবার আসবে না। অকুতোভয়ে জবাব দিলেন, হ্যাঁ পারব, তবে একটা সর্ত। এখানকার সব কাজই আমাকে দিতে হবে। সাহেব এতক্ষণ রাজেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন। এবার চমকাবার পালা তাঁর। তবে সাহেব ছিলেন পাকা জহুরী। রাজেন্দ্রনাথকে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। পলতা জলের কলের ঠিকাদারী তাকে দিলেন।

রাজেন্দ্রনাথের অসহায় অন্ধকার জীবনে আশার আলো এসে পড়লো। ২৪ পরগণার মহকুমা বসিরহাট। তার এক অখ্যাত নগন্য গ্রাম ভ্যাবলা। সেখানে ১৮৫৪ সালে তার জন্ম। পিতা ভগবান চন্দ্রকে হারিয়েছেন অল্প বয়সে। বিধবা মায়ের সম্বল তিনি।

মা ব্রহ্মময়ী চাইতেন ছেলে বড় হয়ে সংসারের দুঃখ ঘোচাবে। শুধু বয়সে বড় হলেই তো হবে না, লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে। কিন্তু

ভ্যাবলা গ্রামে সে সুযোগ কোথায়। বারাসতের স্কুলে কিছুদিন পড়েন রাজেন্দ্রনাথ। কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরলো। শরীর হল ক্ষীণ। মা ব্রহ্মময়ী ভয় পেয়ে ছেলেকে বাড়ী ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর ভাই থাকতেন আগ্রায়। ভাবলেন জায়গা বদল করলে শরীর সারবে। ওদেশে পড়াশুনাও হবে। তখন ভ্যাবলায় ট্রেন পথ খোলা হয়নি। তেরো বছরের বালক চৌত্রিশ মাইল হেঁটে ব্যারাকপুর এলো। তারপর নৌকায় গঙ্গা পেরিয়ে বৈদ্যবাটি থেকে আগ্রার ট্রেনে চেপে বসলো। এদিকে এত ছোট ছেলেকে একাকী বিদেশে পাঠিয়ে মা ব্রহ্মময়ী দুশ্চিন্তায় অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। প্রায় একদিন পরে জ্ঞান ফিরলো বটে কিন্তু স্থায়ীভাবে মূর্চ্ছা রোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। আশ্চর্যভাবে তাঁর সে রোগ সেরে যায়। বছর পনেরো পরে যেদিন ছেলের তৈরী নতুন বাড়ীতে প্রবেশ করেন তাঁর সেই মূর্চ্ছারোগ একেবারে সেরে যায়।

আগ্রায় সেন্ট জন্‌স্ স্কুলে ভর্তি হলেন রাজেন্দ্রনাথ। মন দিয়ে পড়াশুনা করেন। আগ্রায় জলহাওয়ায় ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হল। শরীর সারলো, অবসর সময়ে রাজেন্দ্রনাথ তাজমহলের সামনে বসে থাকেন। সেই অপরূপ সৃষ্টিকে দুচোখ ভরে দেখতেন আর ভাবতেন, আমিও কি পারি না এমন মনোরম একটি সৌধ তৈরী করতে। সে সাধ তার পূরণ হয়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মাণ করে প্রায় চল্লিশ বছর পরে।

আগ্রা থেকে হঠাৎই চলে আসতে হয়। মায়ের আদেশ। দেশে ফিরে বিবাহ করতে হয়। বয়স তখন মাত্র আঠারো। এই সময়ই ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন।

তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হ'ত। রাজেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া। কারণ তাঁর স্বপ্নে রয়েছে তাজমহলের মত সৌধ নির্মাণ। তাই ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। কিন্তু ভবানীপুর থেকে কলেজ ষ্ট্রীট যাওয়া আবার হেঁটে ফিরে আসা শরীরে সইলো না। এমন পয়সা নেই গাড়ীতে যান। এমন সংস্থান নেই পেট ভরে টিফিনে খাবার খান। এমন অবস্থা হল বছর তিনেক প'ড়ে অর্থের অভাবে রাজেন্দ্রনাথ পড়া ছাড়লেন। আর কাজের সন্ধানে সারাদিন টো টো করে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়ান। এমনি সময় আলিপুর চিড়িয়াখানায় কর্পোরেশনের চীফ

৬

ইঞ্জিনিয়ার মিঃ লেসলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাতেই রাজেন্দ্রনাথের জীবনের গতি গেল পাল্টে।

পলতায় কাজ পেলেন রাজেন্দ্রনাথ। মিঃ ফেনউইক নামে এক সাহেব কর্তা তাঁর পিছনে লাগলো। লোকটা "নেটিভ" বলে বাঙালীদের অবজ্ঞা করতো। একজন তরুণ বাঙালী এঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ করবে, তা তার সহ্য হল না। কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ এত নিপুণভাবে পলতার জলের কলের কাজ শেষ করলেন যে শুধু মিঃ লেসলী নন, মিঃ ফেনউইকের মত ছিদ্রান্বেষী লোককেও স্বীকার করতে হ'ল রাজেন্দ্রনাথ সত্যই দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার। যদিও তাঁর ডিগ্রী নেই আর বয়সও খুব কম। কিন্তু হ'লে হবে কি দুষ্ট লোকের অভাব হয় না। পলতার জলের কলের ঘর তৈরি ব্যাপারে রাজেন্দ্রনাথ ফেনউইকের একটা ভুল দেখিয়ে দিলেন। ফেন-উইক তো রেগে আগুন। "কালা আদমী" সাদা সাহেবের ভুল দেখায়। পলতার কাজ থেকে রাজেন্দ্রনাথকে এক কথায় জবাব দিয়ে দিলেন। রাজেন্দ্রনাথ ভয় পেলেন না। টাকা ধার করে ঠিকাদারীর কাজ শুরু করলেন। এদিকে আর একটি কাজ করলেন, পলতার জলের কলের সব মিস্ত্রিকে নগদ মাইনে দিয়ে নিজের কাছে এনে রাখলেন। ওদিকে জলের কলের কাজ বন্ধ। কলকাতায় জল আসে না। ফেনউইককে ডেকে বড়কর্তারা খুব তিরস্কার করলেন। ফেনউইক তখন রাজেন্দ্রনাথের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিরোধটা মিটিয়ে নিলেন। রাজেন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন অন্যায়কারীর আঘাতকে প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতা তিনি রাখেন। যা সত্য বলে মনে করেন তার জন্য যে কোন ক্ষতি তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত। হাওড়ার বর্তমান সেতু যখন তৈরি হয় তখর তার পরিকল্পনা করে ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ। পুরাতন ভাসানো পুলের নক্‌সা পাঠাবার দরকার হয়। সে নক্‌সা তৈরী করেছিলেন রাজেন্দ্রনাথের হিতৈষী মিঃ লেসলী। মিঃ লেসলী রাজেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন যেন নক্‌সাটা সম্পূর্ণ পাল্টানো না হয় কারণ ওটিই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। হাওড়া পুল কমিটির সভাপতিরূপে দেশের মঙ্গলের দিকে চেয়ে মিঃ লেসলীর অনুরোধ তিনি রাখতে পারেননি। তার জন্য মনে ব্যথা পেয়েছিলেন। নব্বই বছরের গুরু সদৃশ বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর অনুরোধ রাখতে না পারার জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন।

পলতার জলের কলের সাফল্যের পর ভারতবর্ষের নানা শহর থেকে

রাজেন্দ্রনাথের ডাক আসে। আগ্রায় জলের কলের নক্সার ভুল ধরিয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিউজ সাহেবের প্রশংসা পান। মিঃ হিউজের চেষ্টায় এলাহাবাদের জলের কল বসানোর কনট্রাক্ট পান রাজেন্দ্রনাথ। সাফল্য আসে। এরপর আগ্রাতেও জলের কলটির ত্রুটি সংশোধন করে সেটি চালু করলেন। মিঃ মার্টিন নামে এক সাহেব রাজেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে মার্টিন কম্পানী নামে এক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

রাজেন্দ্রনাথের কৃতিত্বে মার্টিন কম্পানীর নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। মীরাট, নৈনিতাল, কাশী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে জলের কলের ও ড্রেন তৈরীর কাজ মার্টিন কম্পানী পায়। কিন্তু হাওড়ার জলের কল বসানোর কাজ মার্টিন কম্পানীকে না দিয়ে দেওয়া হয় বার্ণ কম্পানীকে। একজন কালা নেটিভ ডিগ্রিহীন ইঞ্জিনিয়ারের এত সাফল্য সাহেবরা সহ্য করতে পারছিল না। তাই বার্ণ কম্পানী রাজেন্দ্রনাথকে হটাবার জন্য উঠে পড়ে লাগে। কলকাতা ড্রেন তৈরির কাজটা কৌশলে করায়ত্ত করে বার্ণ কম্পানী। সেদিন বার্ণ কম্পানীর এক সাহেব কর্পোরেশন অফিসে রাজেন্দ্রনাথকে গায়ে ধাক্কা দিয়ে অপমান করে বসে। সে অপমান রাজেন্দ্রনাথ ভোলেন নি। ১৯২৭ সালে বার্ণ কম্পানী কিনে নিয়ে সে অপমানের মহৎ প্রতিশোধ নেন।

সাফল্যের প্রায় শীর্ষে যখন রাজেন্দ্রনাথ, মা ব্রহ্মময়ী মারা গেলেন। শিশুর মত কাঁদলেন রাজেন্দ্রনাথ। তিনি জানেন মা না থাকলে তার জীবনে কোন সাফল্যই আসবে না।

মিঃ মার্টিন উইল করে তাঁর স্বত্ব রাজেন্দ্রনাথকে দিয়ে গেছলেন। রাজেন্দ্রনাথ তাই তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম পাল্টান নি।

সারা ভারতে গ্রামে গঞ্জে যাতায়াতের বড় অসুবিধা। বড় ট্রেনে বড় বড় শহরে যাওয়া যায় কিন্তু অখ্যাত গ্রামগুলি ছিল অবহেলিত। তাই ছোট ট্রেন চালাবার পরিকল্পনা করেন। প্রথমে হাওড়া থেকে আমতা তারপর হাওড়া থেকে শিয়াখালায় ছোট ট্রেন চালান। তারপর কালীঘাট থেকে ফলতা, বারাসাত থেকে বসিরহাটেও লাইট রেলওয়ের লাইন বসে। বিহারে আরা থেকে সাসারাম আর বক্তিয়ারপুর পর্যন্ত ছোট ট্রেনের যাত্রী যাতায়াত শুরু করে। ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে সাহেব ব্যবসায়ীরা

একজন বাঙালীর এই সাফল্যে। তারা সরকারকে চাপ দিয়ে লাইট রেলওয়ে বন্ধ করে দেয়।

দমেন না রাজেন্দ্রনাথ। এবার শুরু করেন বিশাল প্রাসাদ তৈরি কাজে। তৈরি করলেন মহীশূর স্মৃতি সৌধ, আগরতলার রাজপ্রাসাদ, চাটার্ড ব্যাঙ্ক, হংকং ব্যাঙ্ক। খ্যাতি, যশ, অর্থ সবই পেয়েছেন রাজেন্দ্রনাথ। বিদেশী ইংরাজ শাসক তাঁকে দিয়েছে 'স্যার' উপাধি। কিন্তু ইংরাজের কাছে এখনও নত হন নি। বাংলার ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ একবার 'বেঙ্গল ক্লাবে' এক ভোজের আয়োজন করেন। নামে বেঙ্গল-ক্লাব হলেও সেখানে বাঙালীর প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু ছোট লাট উডবার্ণ রাজেন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেন। ভোজসভায় সাহেবরা নেটিভ রাজেন্দ্রনাথের পাশে বসে খেতে অস্বীকার করে। তখন অপমানিত রাজেন্দ্রনাথ ভোজসভা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ক্লাব তৈরির ব্যবস্থা করেন। লর্ড এস পি সিংহ তাঁকে সাহায্য করেন। গড়ে ওঠে বিখ্যাত ক্যালকাটা ক্লাব।

১৯৩৭ সালে পরিণত বয়সে কর্মদীপ্ত জীবনের বিপুল অনুপ্রেরণা বাঙালী তরুণদের জন্য রেখে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হন রাজেন্দ্রনাথ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেও যে জীবন ব্যর্থ হয় না রাজেন্দ্রনাথের জীবন তার প্রমাণ।

"সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত কর ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো
নিজেরে করো জয়।"

—রবীন্দ্রনাথ

অহিংস বিপ্লবী মহাত্মাগান্ধী

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া চলেছেন এক তরুণ ভারতীয় ব্যারিস্টার। ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট, পরনেও সাহেবী পোষাক। এমন সময় এক সাদা চামড়ার গোরা যাত্রী কামড়ায় উঠলো। 'কালা আদমী'কে প্রথম শ্রেণীতে দেখে রেগে আগুন। নেমে গিয়ে ডেকে আনলো এক টিকিট চেকারকে। সে এসে টিকিট দেখতে চাইলে তরুণ ব্যারিস্টার বললেন, তাঁর ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট আছে, দেখালেনও টিকিট। কিন্তু টিকিট চেকার বললে তোমাকে কুলীদের কামরায় যেতে হবে। তরুণটি বললেন, তা কেন? আমার ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট আমি এ কামরাতেই যাব।

টিকিট চেকার নেমে গেল, এবার ফিরলো সিপাহী নিয়ে। সিপাহীটি তরুণ ব্যারিস্টারকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কামরার বাইরে বার করে দিলে। জিনিষ পত্রগুলোও ছুড়ে ফেললো প্লাটফর্মের উপর।

তরুণ ব্যারিস্টারটি সেই দারুণ শীতের রাতে খোলা প্ল্যাটফর্মের উপর হিহি করে কাঁপতে লাগলেন। নিদারুণ অপমানে বুকের ভিতরটা জ্বালা করতে লাগলো। এখানেই শেষ নয়—যুবকটি চার্লস টাউন হয়ে জোহানেসবার্গ যাবেন। তখন ট্রেন লাইন পাতা হয়নি। কাজেই ঘোড়ার গাড়ীতে চাপতে হবে। ঘোড়ার গাড়ীকে 'সিগরাম' বলে এখানে।

ঘোড়ার গাড়ীর ভিতরে নিজের সিটে বসতে যাবেন। গোরা কণ্ডাক্টার বললে--তোমাকে ভিতরে বসতে দেওয়া হবে না। ইউরোপীয়রা তোমার মত 'কুলীর' পাশে বসতে রাজি নন। তুমি বসবে গাড়োয়ানের পাশে।

অপমান গিলে ফেলে যুবকটি গাড়োয়ানের পাশেই বসলেন। ঘণ্টা দু'-তিন কেটেছে, সেই গোরাটা বললে—তুমি আমার পায়ের তলায় বোস, আমি তোমার জায়গায় বসবো। একটু হাওয়া খাবো—চুরুটও টানবো।

যুবকটি খুবই শান্ত প্রকৃতির হলেও বেশ তীব্র কণ্ঠেই বললেন—'এ তোমার কেমন ব্যবহার? একবার আমাকে টিকিট থাকা সত্ত্বেও গাড়োয়ানের পাশে বসালে। আবার এখন আমাকে বলছ—পায়ের কাছে বোস, তোমার জায়গায় বসে চুরুট খাব।' কথা শেষ হল না—গোরাটা চোখ রাঙা করে বেয়াদপ 'কুলী' বলে যুবকটির মুখে ঘুষি মেরে বসলো। তারপর হাত ধরে হিঁচড়ে গাড়ী থেকে নীচে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো। যুবকটি ক্ষীণকায় হলেও দেখা গেল ভীতু নয়। বেশ জোরের সঙ্গে গাড়ীর গায়ে আঁটা পিতলের আঙটা আঁকড়ে রইল। এদিকে গুণ্ডা প্রকৃতির গোরাটা যুবকটিকে ঘুষির পর ঘুষি মেরে প্রায় মেরে ফেলার যোগাড় করলো। অন্য যাত্রীরা সাহেব হলেও বেশ একটু বিরক্তই হলেন—গোরাটাকে বললেন, 'সত্য কথাই—তুমি একবার ওঁকে গাড়োয়ানের পাশে বসালে তারপর পায়ের গোড়ায় বসাতে চাইছ—এ তোমার অন্যায়।' গোরাটা একটু দমে গিয়ে মার বন্ধ করলো বটে—কিন্তু কদর্য ভাষায় গালাগালি শুরু করলো।

যুবকটি খোলা গাড়ীর মাথায় বসে ভাবলেন,—এ কোন্ দেশে এলাম। আমি একজন বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার—একজন অশিক্ষিত গোরা আমায় 'কুলী' বলে কেন?

জোহানেসবার্গের অভিজ্ঞতা আরও বিচিত্র। হোটেলের ম্যানেজার বললে—একজন 'কুলী'কে তারা ঘর ভাড়া দেবে না।

কুলী, কুলী, কুলী শুনে শুনে কান ঝালাপালা। কেন একজন ভারতীয় ভদ্রলোককে 'কুলী' বলে অসম্মান করা হয়? ভারতীয় তরুণটি জানতেন না, ঠিক একই সময়ে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে আর এক ভারতীয় যুবক সন্ন্যাসীকে 'নিগ্রো' বলে অসম্মান করা হচ্ছে। সে সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

সময়টা ১৮৯৩ সাল। আমেরিকার বিশ্বধর্ম সভায় যোগ দেবার জন্য নিঃসম্বল অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার পথে পাড়ি দেন। একই বছরে শ্রীঅরবিন্দ ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে ভারতে উপস্থিত হন। আর বোম্বাই থেকে মোহনদাস করমচাঁদ নামে ২৪ বছরের এক তরুণ ব্যারিস্টার লামু, মোম্বাসা, জাঞ্জীবার, মোজাম্বিক, সেখান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার নাতাল বন্দরে পৌঁছান। নাতাল বন্দরই ডারবান।

অপমান আর লাঞ্ছনা সহ্য করে তরুণ ব্যারিস্টার এম. কে. গান্ধী প্রিটোরিয়া উপস্থিত হলেন। এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাঁকে ভারতবর্ষ থেকে আফ্রিকা এনেছিল। আদালতে তাঁদের মোকর্দমা চলছিল বহু লক্ষ টাকার দাবীতে। ব্যারিস্টার রূপে তাদের সাহায্য করবেন মিঃ গান্ধী। ডারবান থেকে প্রিটোরিয়ার পথে অপমানের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলেন—পরাধীনতার কি জ্বালা!

দেখলেন যেসব ভারতীয় আফ্রিকায় আসে তাদের মধ্যে অনেকেই সাহেবদের ক্ষেতে খামারে, কলে কারখানায়, খনিতে কাজ করে 'কুলী' হয়ে। সাহেবদের কাছে পরাধীন ভারতের সব মানুষ যতই শিক্ষিত বা উচ্চবর্ণের হোক না কেন, সবাই কুলী। তাই গান্ধীও "কুলী ব্যারিস্টার"। এই সব কুলীদের জমি কেনার অধিকার নেই। ভোট দেবার কথা তো অবান্তর। এদের উপর অত্যাচার করলেও হয় না প্রতিকার।

বালসুন্দরম্ নামে একটি লোক একদিন গান্ধীর কাছে উপস্থিত হ'ল। সামনের দুটো দাঁত ভাঙা, রক্ত পড়ছে। এক গোরার খামারে কাজ করতো বালসুন্দরম্। সামান্য কারণে গোরা ঘুষি মেরে তার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে।

গান্ধী বুঝলেন এই অত্যাচার থেকে এদের বাঁচাতে হলে একটা প্রতিষ্ঠান চাই। গড়ে তুললেন নাতাল কংগ্রেস ১৮৯৪ সালে। এক বছর আগে গান্ধী ভেবেছিলেন এখানকার মোকর্দমার কাজ মিটলেই ভারতে ফিরে যাবেন। তা আর হ'ল না। প্রায় বিশ বছর রইলেন আফ্রিকায়। লড়াই করলেন হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে। তাঁর অস্ত্র অহিংস সত্যাগ্রহ। ওরা মারবে কিন্তু ফিরিয়ে মারবো না। অহিংসা ও প্রেমে জয় করবো শত্রুর হৃদয়কে।

এই বিচিত্র অস্ত্র নিয়ে ভারতবর্ষে এলেন গান্ধীজী। তিনি বুঝেছিলেন—বিদেশী ইংরেজ এ দেশ না ছাড়লে এ দেশের মঙ্গল নেই। তাই ঘোষণা করলেন ইংরাজের সঙ্গে অসহযোগ। সারা ভারত যেন বহু শতাব্দীর ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলো। নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগলো। লোকে চোখের সামনে দেখলো হাঁটুর উপর খাটো কাপড় পরা জনগণমন-অধিনায়ককে।

দরিদ্র চাষী-মজুর দেখলো এই তো আমাদের আপনজন। থাকেন দরিদ্র মেথরদের সঙ্গে। আহার নিরামিষ। মদ, মাংস স্পর্শ করেন না। কোন

ভোগ-বিলাস নেই। হাজার হাজার টাকা আয়ের ব্যারিস্টার এলেন—সর্বস্ব ত্যাগের ব্রত নিয়ে—দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। আই, সি, এস-এর লোভনীয় চাকরী ছেড়ে এলেন অসামান্য প্রতিভাধর ত্যাগী তরুণ। স্কুল কলেজ, সরকারী গোলামখানা শূন্য হয়ে গেল তাঁর ডাকে। ইংরেজের কারাগারে বারবার তাঁর আশ্রয় হল। দেশের মানুষ তাঁকে ভালবেসে শ্রদ্ধানত চিত্তে নাম দিলেন মহাত্মা গান্ধী।

১৯৩০ সালে সবরমতী আশ্রম থেকে চললেন জুহুর সমুদ্র তীরে দাণ্ডিতে লবণ আইন ভাঙতে। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনের যে বস্তু নুন—তা তৈরী করার অধিকার নেই ভারতবাসীর। তাই গান্ধীজী চললেন নিজের হাতে নুন তৈরী করে আইন ভাঙতে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ফাঁপরে পড়ে গেল। এ কেমন মানুষ! হাতে অস্ত্র নেই—নেই সৈন্যবল, অথচ তার ডাকে ভারতের জনতা উদ্বেল। প্রতিদিন বিশ মাইল করে পথ হাঁটেন আর ভারতের দিকে দিকে ঝড় ওঠে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল। গান্ধীজী বললেন—এবার তোমরা এ দেশ ছাড়ো। ইংরেজ শাসক গান্ধীজী আর সব নেতাদের কারাগারে বন্দী করে রাখলো। আর ভারতের সাধারণ মানুষ এগিয়ে এল স্বাধীনতা সংগ্রামে। বাংলার তমলুকে প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার।

মহাযুদ্ধ শেষ হল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর আঘাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জীর্ণ হয়েছিল। তারা ভারত ত্যাগ করলো। যাবার আগে ভারতকে তারা দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে গেল। গান্ধীজীর কাছে এ আঘাত হয়েছিল মর্মান্তিক। তিনি যে চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানের অখণ্ড ভারত।

খণ্ডিত ভারতের দিকে দিকে রক্ত ঝরতে লাগলো। গান্ধীজী ব্যাকুল হয়ে সে রক্তস্রোত থামাতে চাইলেন। ৭৮ বছরের বৃদ্ধ নোয়াখালির হিংসা বিধ্বস্ত অঞ্চলে বৃথাই ঘুরে বেড়ালেন। এক নির্বোধ আততায়ীর গুলিতে তাঁর জীবনের অবসান ঘটে। সক্রেটিস, লিংকনের মত স্বদেশের কল্যাণে শহীদ হলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক

আইনস্টাইন বলেছিলেন—আজ থেকে শত বৎসর পরে লোকে ধারণা করতে পারবে না—এমন মানুষ পৃথিবীর মাটিতে বিচরণ করতেন।

কৃষাণের বেশে কে ও কৃশ তনু
কৃশানু পুণ্য ছবি,
জগতের আগে সত্যাগ্রহে
ঢালিছে প্রাণের হবি।
অহিংসা যার পরম সাধনা
হিংসা সেবিত বাসে
আসন যাহার বুদ্ধের কোলে
টলস্টয়ের পাশে।

প্রশ্নমালা

দক্ষিণেশ্বরের সাধু

১। সাধুটি কে? কেন তিনি টাকা নিতে রাজি হলেন না?
২। মথুর বাবু কেন গরীব দুঃখী মানুষের জন্য টাকা খরচ করলেন?
৩। সাধুর কাছে কোন্ কোন্ বিখ্যাত লোক আসতেন?

প্রেমিক সন্ন্যাসী

১। নিমাই কেন পুঁথি জলে ফেলে দিয়েছিলেন?
২। চাঁদকাজীর অন্যায় আদেশ কেমনভাবে নিমাই প্রত্যাহার করিয়েছিলেন?
৩। কত বছর বয়সে নিমাই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন? কোন্ কোন্ সেরা মানুষকে তিনি দেশ ও সমাজসেবার কাজে ডাক দিয়েছিলেন?

নবযুগের প্রথম মানুষ

১। 'এতো মানুষের কর্তব্য'—কে, কেন—এ কথা বলেছিলেন?
২। রামমোহন বিলাত গিয়েছিলেন কেন?
৩। নারী জাতির প্রতি তাঁর কেন কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না?

ধুতি-পরা সাহেব

১। বিদ্যাসাগর মশায় কেন চাকরী ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন?
২। তাঁর অগাধ করুণার একটি কাহিনী বল।
৩। তাঁর সাহস ও তেজস্বিতার গল্প বল।
৪। বিদ্যাসাগর মশায় কেন বিধবা বিবাহ আইন পাশ করালেন?
৫। মাইকেল মধুসূদন বিদেশে কার দয়ায় উদ্ধার পান।

স্বদেশপ্রেমী সন্ন্যাসী

১। স্বামী বিবেকানন্দ কেন পালঙ্কের দামী বিছানায় শুতে পারছিলেন না?
২। তিনি কিভাবে 'জাত যায় কেমন ভাবে' পরীক্ষা করেছিলেন?
৩। ভারত পরিভ্রমণের সময় বিবেকানন্দ কি দেখেছিলেন?
৪। বিশ্বধর্ম সভা কোথায় বসেছিল? সেখানে কোন্ আলৌকিক ব্যাপার ঘটেছিল?
৫। তাঁর ত্যাগের আদর্শ নিয়ে কারা কেন এগিয়ে এসেছিলেন?

স্বাধীনতা সংগ্রামী যোগী

১। সাহেব জজ অবাক হয়েছিলেন কেন ?
২। অরবিন্দের দাদামশায় কে ? তাঁকে বিলাত পাঠানো হয়েছিল কেন ?
৩। কেন তিনি আই. সি. এস-এ যোগ দিলেন না ?
৪। "এর পরের ইতিহাস বড় বিচিত্র"—এ কথার অর্থ কি ?
৫। তিনি কেন পণ্ডিচেরীতে চলে গেলেন ?

জগজ্জয়ী বিজ্ঞানী

১। বিবেকানন্দ কার উদ্দেশ্যে কেন সাধুবাদ জানিয়েছিলেন ?
২। জগদীশচন্দ্র কেমন ভাবে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন ?
৩। জগদীশচন্দ্র কেন বেতন নিতে অস্বীকার করেছিলেন ?
৪। বিদ্যুৎ তরঙ্গ যে বহুদূরে সংবাদ নিয়ে যেতে পারে কে কেমন করে তা প্রমাণ করেন ?
৫। তিনি কেন পদার্থবিদ্যার জগৎ ছেড়ে উদ্ভিদ বিদ্যার জগতে চলে যান ?

বিজ্ঞান তপস্বী

১। মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ কাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?
২। প্রফুল্লচন্দ্র 'বাঙালী ভাবটি' কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন ?
৩। হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস লিখে প্রফুল্লচন্দ্র কোন্ ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন ?
৪। তিনি কি আবিষ্কার করে জগদ্বিখ্যাত হন ?
৫। তিনি উত্তরবঙ্গে কেন ছুটে গিয়েছিলেন ? সঙ্গে কে ছিল ?

বাঙ্গালী বিশ্বকবি

১। হিজলী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ কে কেমন ভাবে করেছিলেন ?
২। পুলিশের গাড়ী কেন ফিরে গিয়েছিল ?
৩। 'স্যার' উপাধি রবীন্দ্রনাথ কেন ত্যাগ করেছিলেন ?
৪। কোথায় গড়ে উঠেছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ?
৫। কোন দুটি স্বাধীন দেশে রবীন্দ্রনাথের কি কি সংগীত জাতীয় সংগীত রূপে গৃহীত ?

দরদী কথাশিল্পী

১। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন গিয়েছিলেন কেন ?
২। কেমন করে শরৎচন্দ্রের গল্প লেখা শুরু ?
৩। কার মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র ছোট ছেলের মত কেঁদেছিলেন ?
৪। পুলিশ কোন্ বই লেখার জন্য ইচ্ছা থাকলেও শরৎচন্দ্রকে কেন জেলে বন্দী করতে সাহস করেনি ?

৫। টেগার্ট কবে তাঁর সানভাবেড়ের বাড়ী ঘিরে ফেলে ছিল ?
৬। কে বলেছিলেন তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত ?

বাংলার বাঘ আশুতোষ

১। কেন আশুতোষকে বাংলার বাঘ বলা হ'ত ? এ সম্পর্কে গল্পটি বল।
২। কেমন করে গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের লাজুক ভাব কাটিয়েছিলেন ?
৩। "সবাই যেন অবাক হয়েছিলেন ?"—কোন্ ঘটনায় তা লেখ।
৪। কেমন করে আশুতোষের মাথার অসুখ সেরে যায় ?
৫। আশুতোষ কেন বিলাত যেতে চান নি ?
৬। তাঁর কোন্ স্বপ্ন সফল হয়েছে ?

বহু ভাষাবিদ্ বাঙালী—হরিনাথ দে

১। পোপকে কে কেমন ভাবে অবাক করে ছিলেন ?
২। এ, বি, সি, ডি—হরিনাথ কার কাছে কেমন ভাবে শিখেছিলেন ?
৩। হরিনাথকে ভাষার জাদুকর বলা হ'ত কেন ?
৪। পরীক্ষায় তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের কথা আলোচনা কর।
৫। কোন্ কোন্ ভাষা তিনি জানতেন ? তার সংখ্যা কত ?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

১। গরীব ব্রাহ্মণকে কে কখন কেমন ভাবে সাহায্য করেছিলেন ?
২। কেন তাঁকে লোকে 'দেশবন্ধু' উপাধি দিয়েছিল ?
৩। কোন্ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেন ?
৪। কারাগারে তাঁর কোন দুজন সেবক ছিলেন ?
৫। 'কুলীরা দেখলো তাদের সহায় ও আপন জন আছে।' এই আপন জন কে ? তিনি কি করেছিলেন ?

এ যুগের শিবাজী—সুভাষচন্দ্র

১। সুভাষচন্দ্র কি ছদ্মবেশে কোন্ দেশ হয়ে বার্লিন পৌছেছিলেন ?
২। তিনি কেন সহপাঠীদের বলেছিলেন আজ আমরা উপবাস করবো ?
৩। সুভাষচন্দ্রের ফর্সা মুখ অপমানে লাল হয়েছিল কেন ?
৪। 'এই জিনিস তিনি চাইছিলেন'—কোন্ জিনিস তিনি চাইছিলেন ? ফল কী হয়েছিল ?
৫। আই-সি-এস-এর লোভনীয় চাকুরী তিনি কেন গ্রহণ করেননি ?
৬। সুভাষচন্দ্র 'নেতাজী' নামে কেন ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন ?

বাল গঙ্গাধর তিলক

১। শিবাজী উৎসবের সূচনা কে করেন? তার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে যা জান লেখ।
২। মিঃ ব্যাণ্ডকে কে কেন হত্যা করেছিল? তিনি কোথা থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন?
৩। তিলককে ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ের জেলে কে কেন বন্দী করে পাঠিয়েছিল?
৪। 'লোকমান্য' উপাধি কাকে কেন দেওয়া হয়েছিল?

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

১। 'দেশপ্রিয়' উপাধি কারা কাকে দিয়েছিল?
২। অসহযোগ আন্দোলনে কে ডাক দিয়েছিলেন? ফলে কি হয়েছিল?
৩। যতীন্দ্রমোহন বেশী ফী পাওয়া সত্ত্বেও কেন বোম্বাই যেতে রাজি হন নি?
৪। তাঁর মৃত্যু হয় কোথায়, কেমন ভাবে?

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

১। ব্রেজিলের রাজধানী রাও-ডি-জেনিরোকে কে কেমনভাবে রক্ষা করেছিলেন?
২। সুরেশচন্দ্র বাল্যকালে কী ধরনের দুরন্তপনা করতেন?
৩। তিনি বিদেশে গেলেন কেমন ভাবে? সেখানে কেমনভাবে সাফল্য লাভ করলেন?
৪। তিনি কতগুলি ভাষা জানতেন? কেমন ভাবে গবেষণা ও পড়াশুনা করতেন?
৫। কেন তিনি আর দেশে ফিরে আসেন নি?

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু

১। এমডেন কি? তা কে পাঠিয়েছিলেন? কেমন করে তা ধরা পড়ে গেল?
২। বড়লাটকে কে কোথায় কেমনভাবে বোমা মেরেছিলেন?
৩। ক্ষুদিরাম কে? তিনি কি করেছিলেন? কেন তাঁর ফাঁসি হল?
৪। রাসবিহারী কেমনভাবে ছদ্মবেশে আত্মগোপন করতেন?
৫। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখটি ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?
৬। রাসবিহারী কী ছদ্মনামে কেমন ভাবে জাপানে পলাতক হন?

বিধানচন্দ্র রায়

১। বিধানচন্দ্র কেন এম. বি. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন?
২। কেমন করে বিধানচন্দ্র এফ. আর. সি. এস. ও এম. আর. সি. পি. পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখান?

বাঘা যতীন

১। কে বাঘা যতীনের কাঁধে হাত রেখে কী বলেছিলেন ?
২। বাল্যকালে তাঁর দুরন্তপনার কথা লেখ।
৩। 'বাঘা যতীন' নাম হল কেন ?
৪। কোন্ ঘটনায় ভারত আলোড়িত হয়েছিল ?
৫। বিদেশ থেকে কোন্ জাহাজে করে অস্ত্র কোথায় আনার কথা ছিল ? কে তা আনতে যান ?
৬। বুড়ী বালাম কি ? সেখানে কার সঙ্গে কার লড়াই হয়েছিল ?

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. কারা ? কত সালে এই পরীক্ষা হয়েছিল ?
২। মরেল সাহেব কে ? সে কী ধরনের অত্যাচার করতো ? তাকে বঙ্কিমচন্দ্র কেমন ভাবে শায়েস্তা করেন ?
৩। কোথায় বসে বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখেন ? ফলে কি হয় ?
৪। 'শব পোড়া মড়াদাহের দল' কারা কাদের কেন বলতো ? 'ভট্টাচার্যের চানা' কথার অর্থ কি ?
৫। ডফিন কে ? কেমন ভাবে কার হাতে সে জব্দ হয় ?
৬। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন্ গ্রন্থে আছে ? কে গেয়েছিলেন ?

বাঙ্গালী কর্মবীর

১। যুবক রাজেন্দ্রনাথ কেমন ভাবে মিঃ লেসলীকে সন্তুষ্ট করেছিলেন ?
২। মা ব্রহ্মময়ীর মূর্ছা রোগ কেন হয়েছিল ? সেরেই বা গেল কেমন করে ?
৩। কেমন ভাবে রাজেন্দ্রনাথের জীবনের গতি পাল্টে যায় ?
৪। রাজেন্দ্রনাথের নাম কেন ছড়িয়েছিল ? তাঁর কৃতিত্বের উদাহরণ দাও।
৫। ক্যালকাটা ক্লাব কে কেন তৈরী করেছিলেন ?

অহিংস বিপ্লবী মহাত্মা গান্ধী

১। ভারতীয় তরুণ ব্যারিস্টারের নাম কি ? তাঁকে কারা কোথায় কেমনভাবে অপমান করেছিল ?
২। গান্ধীজী কেন 'নাতাল কংগ্রেস' গড়লেন ?
৩। 'মহাত্মা গান্ধী' নাম কারা কেন দিলেন ?
৪। আইনস্টাইন গান্ধীজীর মৃত্যুতে কি বলেছিলেন ?